রবীন্দ্র সাহিত্যের চিত্রণ : একটি সংক্ষিপ্ত আখ্যান

সুশোভন অধিকারী

য়ুরোপ - প্রবাসীর পত্র' -এর আট নম্বর চিঠিতে টিন-এজার রবীন্দ্রনাথ একটু দূর থেকে বিলেতের একটা ছোটো শহর দেখার বর্ণনা দিয়েছেন এই রকম— 'পাহাড়ের উপর একটা গাছের তলায় গিয়ে বসলুম, দূরে ছবির মতো ঘুমন্ত শহর, একটুও কুয়াশা নেই। নির্জন রাস্তাগুলি, গির্জের উন্নত চূড়া, রৌদ্ররঞ্জিত বাড়িগুলি নীল আকশের পটে যেন একটি কাঠে খোদাই করা ছবির মতো আঁকা ইত্যাদি। রবীন্দ্র রচনাবলীতে মুদ্রিত য়ুরোপ - প্রবাসীর এই সব চিঠিপত্র ওল্টাতে ওল্টাতে আমাদের মনে হয়, সেই ষোলো-সতেরো বছর বয়সেই তাঁর মন আর চোখ কী আশ্চর্য রকমের সজাগ! শহরের একটা সাধারণ দৃশ্যও কী অনায়াসে তাঁর মনে কাঠ-খোদাই ছবির প্রত্যক্ষ অ্যাসোসিয়েশন এনে দেয়! ঠিক যেন একখানা জাপানি উড-কাট্ ছবির প্রিন্ট আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরলেন। সেই সঙ্গে শহরের ছোট্ট বিবরণে টেক্সটের নীচ থেকে যেন ভেসে উঠলো কিছু সাব-টেক্সট্। আর পাঠকের মনে উসকে দিল কিছু অনুসন্ধানী জিজ্ঞাসার টুকরো : ওই সময়েই কি রবীন্দ্রনাথ কাঠ-খোদাই ছবির সঙ্গে রীতিমতো পরিচিত ছিলেন? আশে পাশের তথ্য থেকে মনে হয়, তা অসম্ভবও নয়, কারণ ততদিনে 'ভারতী' প্রকাশ পেয়েছে। তার প্রচ্ছদে ছাপা হয়েছে ত্রৈলোক্যনাথ দেবের কাঠখোদাই করা ছবি— বউবাজার স্ট্রিটের আর্ট স্টুডিয়োর লিথোগ্রাফিতে ছাপা সরস্বতীর আদলে। আর সেই পত্রিকার কাজে জ্যোতিদাদার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। মনে হতে পারে, এই কারণে 'কাঠ - খোদাই' ছবির উপমাটি এমন অনায়াসে তাঁর কলমে এসে দেখা দিল। এছাড়াও দেখা যাবে তাঁর ছেলেবেলার একটি প্রিয় বই 'রবিনসন ক্রুসো', তার যে বাংলা অনুবাদটি তিনি পড়েছিলেন— সেখানে আঠারোটি কাঠ-খোদাই ছবি ছিল। তাঁর অন্য একটি বই 'মরমেত/অর্থাৎ/মৎস্যনারীর উপাখ্যান' -এ মুদ্রিত ছিল রামধন দাস স্বর্ণকারের একটি কাঠখোদাই ছবি। 'মরমেত' শিরোনামের এই বইটি নিশ্চয়ই 'মারমেইড' (Mermaid)। ছোটবেলায় পড়া বইয়ের ছবির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিঠিপত্র, 'জীবনস্মৃতি' বা 'ছেলেবেলা'য় নানান ছোটোখাটো উল্লেখ করেছেন। যেমন 'বই পড়ার কথা প্রথম যা মনে পড়ে যে ষণ্ডামার্কা মুনির পাঠশালার বিষম ব্যাপার নিয়ে, আর হিরণ্যকশিপুর পেট চিরছে নৃসিংহ-অবতার- বোধ করি সীসের ফলকে খোদাই করা তার একখানা ছবিও দেখেছি সেই বইয়ে'। বা 'আমাদের বাড়িতে পাতায় পাতয় চিত্রবিচিত্র - করা কবি ম্যুরের রচিত একখানি আইরিশ মেলডিজ ছিল। অক্ষয়বাবুর কাছে সেই কবিতাগুলির মুগ্ধ আবৃত্তি অনেকবার শুনিয়াছি। ছবির সঙ্গে বিজড়িত সেই কবিতাগুলি আমার মনে আয়র্লন্ডের একটি পুরাতন মায়ালোক সৃজন করিয়াছিল।' অথবা সচিত্র মাসিক পত্রিকা' বিবিধার্থ-সংগ্রহ' বিষয়ে বলেছেন 'সেই বড়ো চৌকা বইটাকে বুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তক্তাপোষের উপর চিত হইয়া পড়িয়া নর্হাল তিমিমৎসের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ণকুমারী উপন্যাস পড়িতে কত ছুটির মধ্যাহ্ন কাটিয়াছে।' এছাড়াও আছে মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরী ঘরে ঢুকে ছবির বই দেখার গল্প। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে লিখেছেন, 'একটি বড়ো ঘরের দেওয়ালের খোপে খোপে মেজদাদার বইগুলি সাজানো ছিল। তাহার মধ্যে, বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা, অনেক ছবিওয়ালা একখানি টেনিসনের কাব্যগ্রন্থ ছিল। সেই গ্রন্থটিও তখন আমার পক্ষে এই রাজপ্রাসাদেরই মতো নীরব ছিল। আমি কেবল তাহার ছবিগুলির মধ্যে বারবার করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম।' অর্থাৎ এই সব মুদ্রিত চিঠিপত্র বা স্মৃতিকথা ওল্টালে আমাদের মনে হয়, বাল্যকাল থেকেই নানা আঙ্গিকের ছবি দেখবার অভ্যাস তাঁর ছিলো। তাই বুঝি 'য়ুরোপ - প্রবাসীর পত্র' -এর ওই চিঠিতে শহরের বর্ণনায় অমন সহজে 'কাঠে খোদাই করা' ছবির তুলনাটি টানতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

এখন, রচনাবলীর পাঠ— 'কাঠে খোদাই করা' এই মন্তব্যটিকে— ঘিরে আমরা হয়তো অনেকদুর চলে এসেছি, এবারে একটু পিছিয়ে গিয়ে দেখা যাক। 'য়ুরোপ -প্রবাসীর' সেই মূল চিঠিগুলি কোথাও রক্ষিত হয়নি, তাই সতেরো বছরের কিশোরের কলমে ঠিক কি লেখা হয়েছিল, তা আমরা জানি না। তবে প্রথম সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেও রচনাবলীর পাঠের থেকে এর কিছু পার্থক্য আমাদের নজরে পড়বে। প্রথম সংস্করণের পাঠটি ছিল এই রকম— 'দূরে ছবির মত সহর দেখা যাচ্ছে, একটি লোকও তখন ওঠে নি, একটুও কোয়াষা নেই, চারিদিক অত্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ঘুমন্ত সহরটা খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। তার নির্জ্জন রাস্তাগুলি, গির্জ্জের উন্নত চূড়া, রৌদ্র-রঞ্জিত বাড়িগুলি নীল আকাশের পটে যেন একটি অতি স্পষ্ট ছবির মত আঁকা।'

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, প্রথম সংস্করণের সেই পাঠ 'অতি স্পষ্ট ছবি'র পরিবর্তে 'কাঠে খোদাই করা' বা উড-কাট্ প্রিন্টের এই উপমা— প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী কালের বেশ সচেতন সাহিত্যিক অলংকরণ। এবং তখন তো রবীন্দ্রনাথ রীতিমতো চিত্রীও। তাই এখানে স্পষ্ট করে বলতে কোনো বাধা নেই যে ছেলেবেলা থেকে ছবির প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করলেও ছবির মাধ্যম বা আঙ্গিকের খুঁটিনাটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতা ততটা জোরালো ছিলো না, এবং তা থাকবার কথাও নয়। সে পর্বে সুন্দর কোন কিছু দেখলেই 'ছবি' বা 'ছবির মত' বলতে ইচ্ছে করে তাঁর। পরবর্তী কালে 'ছিন্নপত্রাবলী'তেও শব্দ দিয়ে তিনি রচনা করেছেন অজস্র চিত্রমালা। আরও পরে তাঁর আলোকসামান্য স্মৃতির ডালি তিনি মেলে ধরেছেন শব্দ আর অক্ষরের জাল বোনা অসংখ্য ছবিতে। এই সব স্মৃতিকথা আমাদের ভাবনার অন্যতম আকর হলেও তাকে যাচিয়ে নিতে হয় পারিপার্শ্বিক তথ্যের কষ্টিপাথরে। আর একই সঙ্গে এখানে বলতে হয়,

তাঁর লেখায় ফুটে ওঠা ছবি আর তার পাশে সাজিয়ে দেওয়া শিল্পীদের আঁকা ছবি— যা বার বার ছাপিয়ে যায় অলংকরণের ছোট্ট সীমানা— এরা বরাবর এগিয়ে চলে তাদের স্বতন্ত্র সত্তার নিজস্ব চলনে। এবারে কবির কলম আর তাকে ঘিরে শিল্পীদের রেখার চলনের দিকে একটু দৃষ্টি ফেরানো যাক।

রবীন্দ্ররচনার প্রথম চিত্র হিসেবে আমাদের মনে পড়ে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' (১২৯২) পত্রিকায় মুদ্রিত ছবির কথা। আর একই সঙ্গে বলতে হয়, রবীন্দ্ররচনার প্রথম চিত্রকর হিসেবে শিল্পী হরিশচন্দ্র হালদার ওরফে হ চ হ -র কথাও। যিনি এই পত্রিকার পাতাগুলি ছবিতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। হিসেব করলে দেখা যাবে ওই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনা যেমন সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি, তেমনি মাত্র দু-তিনটি ছাড়া 'বালক' -এর প্রায় সমস্ত ছবিই এঁকেছিলেন হরিশচন্দ্র। ছেলেবেলার সহপাঠী এই অসমবয়সী বন্ধুর কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি' 'গল্পসল্প' বইতে লিখেছেন। ছবি আঁকা ছাড়াও নাটক রচনা, অভিনয় ও মঞ্চসজ্জার প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এই উদ্যমী চিত্রকর। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সে হরিশচন্দ্র রচিত নাটকে অভিনয় করেছিলেন। দেখা যায়, কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে, হেনরি লকের অধ্যক্ষতাকালে হরিশচন্দ্র লিথোগ্রাফি এবং চিত্রকলার পাঠ নিয়েছিলেন। সচিত্র এই 'বালক' পত্রিকা শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান' -এর সঙ্গে হরিশচন্দ্র হালদারের আঁকা ছবি দিয়ে। কবিতার ভাব অনুসারে, সাদা-কালোতে আঁকা এই বিবরণধর্মী ছবিতে একটি সাধারণ ঘরের ভিতরকার দৃশ্য ফুটে উঠেছে।ছবির কেন্দ্রস্থলে হাসি -হাসি মুখ করে মা তার শিশুকে কোলে নিয়ে ঘরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে, পাশে আর একজন বালক বসে রয়েছে মায়ের গা-ঘেঁসে। পিছনের দিকে আবছা অন্ধকারে ঠাকুমার মতো এক বৃদ্ধা কৌতূহলী দুই নাতিকে গল্প শোনাচ্ছেন। ডান দিকের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বৃষ্টিভেজা গ্রামের পথ-মাঠ-ঘাট, মন্দিরের চুড়ো ইত্যাদি। আর প্রায় আপাদমস্তক কাপড়ে ঢাকা এক পুরুষমূর্তি সেই খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে —বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। এদিকে ঘরের ভিতরে পলেস্তারা খসে যাওয়া দেয়ালে জগন্নাথের পট, দড়িতে পরিপাটি করে ঝুলিয়ে রাখা জামাকাপড়, ছাদের কড়ি-বরগা থেকে নেমে আসা ঝুলন্ত শিকেয় খাবারের পাত্র, দাঁড়ে ঝোলানো পাখি, দেয়ালে নকসাদার কুলুঙ্গিতে রাখা জিনিসপত্র থেকে শুরু করে ঘরের কোণে গেলাস-ঢাকা-দেওয়া জলের কুঁজো, বাতিদানে জ্বলন্ত প্রদীপ বা তার পাশে পোষা বেড়ালের দুধ খাওয়া— ইত্যাদি সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় অত্যন্ত যত্নে চিত্রিত। এমন কি প্রদীপের আলোকে জড়ো হওয়া পোকামাকড় খেতে আসা টিকটিকি পর্যন্ত সমান গুরুত্ব দিয়ে আঁকা হয়েছে। ফলে এ ছবি বুঝি হয়ে উঠেছে ডিটেলের স্তুপ। আবার ছবির আলো-আঁধারিতে বা ফিগারগুলির জামাকাপড়ের ভাঁজে যেন ইয়োরোপীয় কায়দায় আলোছায়া খেলা ফোটানোর চেষ্টা রয়েছে— সব মিলে এই ছবিতে সেই পর্বে আর্ট-স্কুলের শিক্ষার একটা প্রতিফলন নিশ্চিত ভাবেই ধরা পড়েছে। হরিশচন্দ্র হালদারের আঁকা এই ছবি দেখতে দেখতে উনিশ শতকে কোলকাতায় বেড়াতে আসা সেই সব বিলেতী শিল্পীদের কাজের একটা আলগোছে ছাপ নজরে পড়ে, বিশেষত মাদাম বেলনসের আঁকা বিভিন্ন ঘরোয়া বিষয়ের ছবির সঙ্গে কোনো কোনো জায়গায় এর মিল বেশ স্পষ্ট। বাংলা সাময়িক পত্রিকা - চিত্রণের ইতিহাসে এ ধরনের ছবির একটা জায়গা অস্বীকার করার উপায় নেই।

'বালক' -এ মুদ্রিত রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে আঁকা অন্যন্য ছবির মধ্যে 'মা লক্ষ্মী', 'সাত ভাই চম্পা', 'দশ দিনের ছুটি', 'হাসিরাশি', 'রাজর্ষি' ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়াও 'বল্ গোলাপ, মোরে বল্' বা 'রিম ঝিম ঘন বরষে' ইত্যাদি গানের সঙ্গে আঁকা ছবিগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে 'রিম ঝিম ঘন বরষে'র ছবিতে গানের অনুপুঙ্খ বিবরণ— মেঘ-বিদ্যুৎ-বৃষ্টির প্রেক্ষাপটে ময়ূরের নাচ বা চমকে-ওঠা ত্রস্ত হরিণের চঞ্চল ভঙ্গী সহযোগে, আলোছায়ার স্নিগ্ধ বিন্যাসে এ ছবি তৈরি হয়েছে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে এটিই হয়তো রবীন্দ্রনাথের একটি প্রথম পরিপূর্ণ সফল চিত্রণ। এ গুলি বাদে 'দশ দিনের ছুটি'র ছবিতে 'ডাকবাঙ্গালার বারান্দার সম্মুখে কেদারায় একলা চুপ করিয়া বসিয়া' থাকা যুবক রবীন্দ্রনাথের ছবিটি রীতিমতো ইনটারেস্টিং। বা 'রাজর্ষি'র একটি ছবিতে কুটিরের বন্ধ দরজার সামনে দাওয়ার উপবিষ্ট জয়সিংহের ভঙ্গীতে অনেকটা রবি বর্মাসুলভ নাটকীয়তা বেশ চোখে পড়ার মতো। কিংবা 'রাজর্ষি'র শেষ অধ্যায়ে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে পা ছবিয়ে বসে থাকা, প্রায় সান্তাক্লজের মতো দাড়ি-গোঁফ ওয়ালা বিশ্রামরত খুড়াসাহেব তথা খড়গ্ সিংহের পোশাক-পরিচ্ছদকে সমস্ত ভঙ্গীই যেন বিদেশী ছবি থেকে উঠে এসেছে। আবার 'কাল মৃগয়া'য় জঙ্গলের মধ্যে কুটিরের সামনে অন্ধ ঋষি ও ঋষিকুমারের ছবিতে বিদেশি প্রভাব সহজেই বোঝা যায়। বিশেষ করে অন্ধ ঋষির খোলা শরীরের অ্যানাটমিতে, তার পেশীর উত্তল-অবতল অংশে বা শিরা-উপশিরার ড্রয়িং-এ স্বাভাবিকতার অনুসরণ নজর কাড়ে যা পশ্চিমের ক্লাসিকাল ছবি ও ভাস্কর্যের দ্বারা নিশ্চিত ভাবে প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও 'বালক''-এর অন্যান্য লেখায়, যেমন সত্যেন্দ্রনাথের 'বোম্বাই সহর' শীর্ষক রচনার সঙ্গে 'রণ-ক্ষেত্রে চাঁদবিবি' ইত্যাদি হ চ হ -র আঁকা অন্যান্য ছবিও আমাদের ওয়েস্টার্ন মাস্টারদের ছবি স্মরণ করায়।

এখানে একটা কথা আমাদের জানতে ইচ্ছে করে, এই ছবিগুলির বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতামত ঠিক কি রকম ছিল! 'বালক'-এর ছবিগুলি তাঁর পছন্দসই হচ্ছিল কিনা— সে বিষয়ে কোনো খবরাখবর আমাদের চোখে পড়ে না। আবার অন্যদিকে একথাও বলতে হয়, ছবিগুলির প্রতি নিশ্চয়ই তরুণ কবির সমর্থন ছিল — অন্যথায় হরিশচন্দ্র হালদার 'বালক' -এর প্রধান চিত্রকর হয়ে উঠতেন না। সে পর্বে অবশ্য অবন-গগন তখনো বিকশিত হয়ে ওঠে নি, তাই হয়তো ভাগনে সত্যপ্রসাদ ছাড়া আর কাউকেই সেখানে তেমন ভাবে পাওয়া গেলো না। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের ছবি বিষয়ক

ভাবনার যে দু-এক টুকরো আভাস তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়, সেখানে দেখা যায় যে, রিয়েলিস্টিক মোড়কে গড়ে ওঠা অ্যাকাডেমিক আর্টের প্রতিই তখন তাঁর পক্ষপাত সুস্পষ্ট। তাই রিয়েলিস্টিক আদলে আঁকা হ চ হ -র ইলাস্ট্রেশনে তাঁর আপত্তি হবার কথা নয়। এমন কি আরো পরে 'ছিন্নপত্রাবলী' পর্বে রবি বর্মার ছবির বেশ প্রশংসাও শোনা যাবে রবীন্দ্রনাথের কন্ঠে। যদিও কবির এই মুগ্ধতা খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। স্বদেশী আন্দোলনের হাত ধরে তিনি শীঘ্রই ভারত শিল্পের শিকড়ের অনুসন্ধানে সচেষ্ট হয়েছেন, ঝুঁকেছেন দেশী শিল্পের দিকে। অবশ্য এ সব যে খুব দ্রুত ঘটেছে তা নয়। একটা বিস্তৃত সময়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে তাঁর শিল্প - ভাবনার বিবর্তনের এই পথরেখাটি। পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে এই বিষয়ের একটি অসাধারণ চুম্বক আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। তরুণ রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনার ধারাটি এই রকম।

'ঘর বদল করা বাবার যেমন অভ্যাস ছিল — ঘরের সাজসজ্জারও পরিবর্তন করতেন ঘন ঘন। খুব ছেলেবেলায় দেখতুম, বিলাতি ছবির প্রতিলিপি টাঙানো থাকতো সারা দেয়ালে। দু-একটা ছবির নামও মনে পড়ে— যেমন বার্ন-জোন্সের আঁকা 'আশা' ও মিলের-র আঁকা 'বীজ ছড়ানো'। তারপর এল রবি বর্মার যুগ। বিলাতি ছবি ফেলে দেওয়া হল, রবি বর্মার ছবির বড়ো বড়ো ওলিওগ্রাফ প্রিন্টে দেওয়াল গেল ভরে। বিলাতি ঢঙের আঁকা এই ছবিগুলিও বেশিদিন ভালো লাগলো না। একদিন সেগুলিও গেল, এর কতকগুলি পৌরাণিক আখ্যানের ছবি — সাগরমন্থন, সর্পযজ্ঞ প্রভৃতি কত কি অদ্ভুত চিত্রাঙ্কন। এগুলি কোন শিল্পীর আঁকা তা এখনো পর্যন্ত জানি না।'

কবিপুত্র রথীন্দ্রের স্মৃতিকথা থেকে রবীন্দ্রনাথের এ পর্বের চিত্রভাবনার স্তরগুলি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে আসে। তবে এখানে বলে নেওয়া দরকার, যে 'আশা' ছবিটি সম্ভবত জি এফ ওয়াট্‌সের আঁকা, বার্ন-জোন্সের নয়। জগদীশচন্দ্র বসু যে ছবির একটি প্রতিলিপি বিলেত থেকে রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। আর 'পৌরাণিক আখ্যানের' ছবিগুলি নিঃসন্দেহে বৌবাজারের ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিয়োর ছবি— যা এক সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো।

রবীন্দ্ররচনার অলংকরণ বা রবীন্দ্রনাথের লেখা অবলম্বনে আঁকা ছবি হিসেবে যে সব উদাহরণ এর পরে আমাদের হাতে এসে পৌঁছয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো 'চিত্রাঙ্গদা'। 'চিত্রাঙ্গদা'র 'যত্নরচিত চিত্রগুলি' এঁকেছেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর এই কাব্য স্নেহের অবনকেই উৎসর্গ করেছেন। 'চিত্রাঙ্গদা'য় লেখা ও রেখার সম্মিলনে কাকা আর ভাইপোর এই আলোকিত যুগলবন্দী এক মাইল-ফলকের মতো। রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যটি লেখার কিছু আগেই তাঁর দ্বিতীয় ইয়োরোপ সফর থেকে সদ্য ফিরেছেন। মহাভারতের সেই শীর্ণকায় কাহিনীটি যেন তাঁর কলমে এক আধুনিক পুনর্জন্ম লাভ করেছে। আর এই কাব্যনাট্যের নানা টুকরোয়, একাধিক চিত্রকল্পে ধরা পড়েছে কবির সদ্য ইয়োরোপ সফরে চিত্র-ভাস্কর্যের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আশ্চর্য টিপছাপ। যদিও তরুণ শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের রেখাঙ্কনে ইয়োরোপীয় ক্লাসিকাল ছবির চিহ্ন হয়তো ততটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। অথচ এর আগেই 'সাধনা' পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কবিতার জন্যে অবনীন্দ্রনাথ যে ছবি আঁকলেন, সে ছবির অবয়বের মন্ডনধর্মীতা বা ভাস্কর্যসুলভ ঘনতা, প্রায় ক্লাসিকাল পেন্টিংয়ের কাছাকাছি। এবং ছবির বিষয়গগত দিক দিয়েও— ডানাওয়ালা পরীর মাথার উপরে চাঁদ ও তার পায়ের কাছে অর্ধ অনাবৃত শায়িত, নিদ্রিত পুরুষমূর্তির ছবি— বিখ্যাত পুরাণের গল্প 'ডায়ানা' ও 'এন্‌ডিমিয়িন'কে স্মরণ করায়। তবে তার ঠিক পরেই আঁকা 'চিত্রাঙ্গদা' সিরিজের ছবিতে টোন অপেক্ষা রেখার প্রাধান্য বেশি। হয়তো ছাপার খরচের দিকে তাকিয়ে ছবিগুলি রেখাঙ্কনে রচিত হয়েছিলো। আর এই কারণেই 'চিত্রাঙ্গদা'র ছবি অনেক বেশি দ্বিমাত্রিক। এখানে আর একটা কথা বলতেও দ্বিধা নেই, এই কাব্যনাট্যে চিত্রাঙ্গদার নগ্ন সৌন্দর্যের দিকটি কবির ভাষায় যতটা উন্মোচিত হয়েছে— যা পশ্চিমের ক্লাসিকাল আর্টের প্রায় সমান্তরাল— শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের রেখায় তা তেমন ভাবে ফুটে উঠতে পারে নি। বিশেষ করে নবরূপ প্রাপ্ত চিত্রাঙ্গদার অসাধারণ দেহ - বর্ণনায়, 'রবিকা'র শব্দমালার পাশে অবনের সসঙ্কোচ রেখাঙ্কন মোটেও দাঁড়াতে পারে না। যেমন, 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, মণিপুরে অরণ্যের মধ্যে শিবালয়ের, দূর থেকে অর্জুন যখন 'সরোবর - সোপানের শ্বেত শিলাপটে' চিত্রাঙ্গদার স্নান লক্ষ্য করেছেন— সেই মায়াবি বর্ণনার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথে আঁকা ছবি যথেষ্ট দায়সারা গোছের ঠেকেছে আমাদের চোখে।

'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের গোড়ার দিকে, মণিপুর অরণ্যে শিবালয়ে, যেখানে অর্জুন দুর থেকে সুরূপা চিত্রাঙ্গদার নির্জন - স্নান অবলোকন করছেন— সে দৃশ্যটি আঁকবার সময় অবনীন্দ্রনাথও চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়েছেন অনেক দূর থেকে। ফিল্মের ভাষা ব্যবহার করলে বলতে হয়, এখানে যেন ক্যামেরার লং-শটে দৃশ্যটি ধরেছেন অবনীন্দ্রনাথ। কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই, কাব্যনাট্যে কাকার বুনে দেওয়া ভাষার সেই অলৌকিক ইন্দ্রজাল ভাইপোর রেখায় তেমন ভাবে ফোটে নি, সত্যি কথা বলতে গেলে, বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের লেখার সেই অসাধারণ অনুভূতির পুরোটাই এখানে অনুপস্থিত। বিশেষ করে বর্তমান ছবিতে কবিতার শব্দরূপের সেই মোহময়তা পাঠক - দর্শকের মনে মোটেও দাগ কাটতে পারে না। অবশ্য তাঁর শিল্পী জীবনের সূচনা পর্বে কবিতার ছবি রচনার এই সব দুর্বলতার কথা অবনীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন আমাদের। স্মৃতিকথায় শুনিয়েছেন, প্রথম জীবনে অপটু হাতের রেখায় আঁকা 'চিত্রাঙ্গদা' কাব্যনাট্যের জন্য আঁকা 'সেসব ছবি' দেখে পরিণত বয়সে তাঁর 'হাসি' পাওয়ার গল্প। যদিও এখানে নিশ্চিতভাবেই উল্লেখ করা দরকার যে, 'চিত্রাঙ্গদা' পর্বের অবনীন্দ্রনাথ তখনোও তাঁর শিল্পধারার নিজস্ব পথটি আবিষ্কার করে উঠতে পারেন নি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিচিত্র সংমিশ্রণে তাঁর নিজস্ব শৈলীর বিশেষ শিল্পভাষা প্রকাশিত হয়েছে অনেক পরে। আর সেই

অবনীন্দ্রনাথ, কি এক আশ্চর্য রূপকথায় মোড়া দৃশ্যজগতের মাঝখানে দর্শকদের পৌঁছে দেন, কি এক অলৌকিক সিংহদুয়ারের চাবি— নিঃশব্দে ধরিয়ে দেন রসিক দর্শকের হাতের মুঠোয়!

রবীন্দ্রসাহিত্য অলংকরণের ইতিহাসে যে সুদীর্ঘ তালিকা দেখা যায়, তাকে অনুসবণ করলে 'চিত্রাঙ্গদা'র পর 'সখা ও সাথী' বা 'মুকুল' ইত্যাদি পত্রিকা অথবা ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত 'শারদোৎসব' -এর প্রচ্ছদের কথা স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে। এখানে স্বীকার করে নেওয়া উচিত, যে চিত্রত রবীন্দ্ররচনার ক্রম অনুসারী দীর্ঘ তালিকাসহ অনুপুঙ্খ বিবরণ নির্মাণ করা এ রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায়, সমস্ত শৈলী অনুযায়ী কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থ ও তার চিত্রণের দিকে নিঃসন্দেহেই কিছুটা পক্ষপাত ঘটেছে— যা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া ভালো।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগের পর্বে, কবি হিসেবে বিশ্বের দরবারে পৌঁছানোর পূর্ব মুহূর্তে ছবি ও কবিতায় মোড়া তাঁর 'চয়নিকা' কাব্যসংকলনটি নিশ্চিভাবে এক উল্লেখ্য মাইলস্টোন। পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'সঞ্চয়িতা'র মতো একটি সম্ভবত প্রথম রবীন্দ্রকবিতার একটি সংকলিত গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশ। অবশ্য যেহেতু এখানে গ্রন্থচিত্রণ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে তাই নন্দলালের ছবিই এখানে বিবেচ্য। 'চয়নিকা'য় মুদ্রিত ছবিতে তরুণ নন্দলালের স্টাইলে রং ও রেখার বিচিত্র ধারা লক্ষ্য করা যায়। এ ছবিগুলির কোনোটি কেবল রেখাঙ্কন, কোথাও বা রয়েছে ওয়াশ - টেম্পারায় আঁকা সেই পর্বের অবনীন্দ্র অনুসারী চিত্রশৈলীর সুস্পষ্ট চিহ্ন, আবার কোনো ছবিতে কালিতুলির প্রভাব যেন ওয়াশের কোমল স্নিগ্ধতাকে ছাপিয়ে উঠেছে— যা আগামীদিনের রেখা ও আকারের নন্দলালকে চকিতে চিনিয়ে দেয়। এমনি এক উদাহরণ হলো 'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে'। এ ছবিতে প্রস্ফুটিত পদ্মের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এক নারীমূর্তি। তার সম্মুখে প্রসারিত হাতের প্রদীপ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে ধূপের ধোঁয়ার কুণ্ডলী। আর সেই ধোঁয়ার কুণ্ডলী যেন সর্পিল আল্পনার মতো বা লতার আকর্ষের মতো বঙ্কিম গতিতে সমগ্র চিত্রপট অধিকার করছে। এবং ওই দণ্ডায়মান নারীমূর্তি যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের পুজোর ঘরের ডেকরেটিভ বাতিদান, শিল্পীর রচনার কৌশলে দর্শকের চোখে সেটা সহসা ধরা পড়ে না।

'কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া বাহির হনু তিমির রাতে' ছবিটি রেখাঙ্কনে আঁকা। এ ছবিতে কাঁধের লাঠিতে জিনিসপত্র চাপিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলেছে এক যুগল মূর্তি। সাদা আয়তাকার চিত্রপটের বাঁ দিক ঘেঁষে আছে এই যুগল। মূর্তিদ্বয়ের সামনে ছড়িয়ে থাকা স্পেসের যে শূন্যতা, তা কবিতায় নিরুদ্দেশ পথে বেরোনোর মুডটিকে বেশ ছুঁয়ে যায়। ঠিক এমন ভাবেই রেখাঙ্কনের আর একটি ছবিতে— 'আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিন শেষের শেষ খেয়ায়' —চিত্রপটে সচেতন ভাবে ছেড়ে যাওয়া বিস্তৃত শূন্যস্থান ছবির একাকীত্ব মাখানো করুণ অসহায়তাকে নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে, যা কবিতাটির ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত। চিত্রপটের একেবারে ডানদিকের কোণে, লাঠি হাতে বোঝা কাঁধে নিয়ে এক বৃদ্ধের বাঁকা ন্যুব্জ শরীর যেন দূরের কোনো নৌকার জন্যে অপেক্ষায় অধীর। এ ছবিতে ভূমিরেখা ছুঁয়ে থাকা মানুষটির সামনে উল্লম্ব আয়তাকার ফাঁকা ওই স্পেস যেন এক উদাসী বিস্তার! দুটি ছবিতেই বিন্যাসের কাঠামো আর চিত্রপটে বিষয়কে সাজিয়ে দেওয়ার বিশেষ ভঙ্গি দূর-প্রাচ্যের ছবিকে নিঃসন্দেহে মনে করিয়ে দেয়। অবশ্য এখানে একথাও স্মরণে রাখা দরকার, যে বিশ শতকের একেবারে গোড়াতেই জাপানি ভাবুক ও দার্শনিক ওকাকুরার সঙ্গে জাপানি শিল্পী টাইকানের এদেশে আসার কথা আমরা সকলেই জানি। ঠাকুরবাড়িতে এই তরুণ শিল্পী টাইকানের কালিতুলির কাজ যে অনেকেরই নজর কেড়েছিলো তাও আমাদের অজানা নয়। তাই নন্দলালের এ পর্বের ছবিতে জাপান-কানেকশন কোনো আশ্চর্য ঘটনা নয়। বিশেষ করে বাংলা কলমে ছবিতে দূর-প্রাচ্যের ছবির প্রভাব নিয়ে বিস্তর লেখালেখি হয়েছে। এমনকি 'হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ' শীর্ষক শিবের তাণ্ডব নৃত্যের রঙিন ছবিটিতেও ফার ইস্ট-এর প্রভাব সুস্পষ্ট।

তবে 'চয়নিকা'য় নন্দলালের যে সাদাকালো ছবিটি আমাকে সবচেয়ে বেশি টানে, সেটি এক নারীর আত্মহত্যার দৃশ্য —'যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও সলিল মাঝে'। এটিও রচিত হয়েছে অনেকটা জাপানি স্ক্রোল জাতীয় ছবির বিন্যাসের আদলে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, আবছায়া অন্ধকারে জলের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে এক ঘোমটা দেওয়া নারী প্রতিমা। গা ছমছমে নির্জনতায় আধো-ছায়া আধো-অন্ধকারে আকাশ থেকে চাঁদের ম্লান আলো জলের উপর এসে পড়েছে। আর সেই ম্লান অস্ফুট আলোকে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে দূরের গাছগাছালির বিষণ্ণ সিলুয়েট। সব মিলে গোটা ছবি জুড়ে যেন একটা চাপা উৎকণ্ঠার চিহ্ন নিঃশব্দে জড়িয়ে ধরেছে। অনেকটা সরু পটের মতো লম্বাটে ধরনের এই ছবির প্রয় মাঝামাঝি জায়গায় আঁকা হয়েছে নারীমুখটি। ডুবে যাওয়া সেই নারী মূর্তির গলা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে— আর বাকিটা জলের মধ্যে অদৃশ্য। এ ছবিতে পটের নীচের দিক থেকে ঘন কালো জলের গাঢ় রঙের টোন ক্রমশ উপরের দিকে কিছুটা ফিকে হয়ে এসেছে। ছবির উপরের দিকে আকাশের অংশ অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও আকাশের এক কোণে চাঁদের ম্লান আলোর আভা ছড়িয়ে আছে।

নন্দলালের ছবিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, এ ছবি যেন রবীন্দ্রনাথের সেই 'ঘাটের কথা' গল্পের শেষ দৃশ্য হয়ে উঠতে পারে অনায়াসে। যেখানে গল্পের নায়িকা কুসুম, নদীর ধারে ভাঙা মন্দিরে আশ্রয় নেওয়া আগন্তুক সন্ন্যাসীর প্রত্যাখ্যানে নিজেকে শেষ করে দেবার জন্যে ধীরে ধীরে প্রস্তুতি নিচ্ছে— 'কুসুম কহিল, ''তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিতে হইবে।'' বলিয়া ধীরে ধীরে জলে নামিল। এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময় এ জল যদি হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে। চাঁদ অস্ত

গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু বুঝিতে পারিলাম না। অন্ধকারে বাতাস হু হু করিতে লাগিল। পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়।'

'নতুন বৌঠান' কাদম্বরী দেবীর আত্মহননের পর রবীন্দ্রনাথের কলমে মৃত্যুর যে অদ্ভুত অবসেশন তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, কবিতার কথা সরিয়ে রাখলে 'ঘাটের কথা', বোধ করি তার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। 'রাজপথের কথা'র মধ্যেও আশ্চর্য করুণ হয়ে ফুটে আছে বিষাদ মাখানো মৃত্যুর ছায়া। 'ঘাটের কথা' ছোট গল্পটি নন্দলালের পড়া ছিলো কিনা, তা আমরা জানিনা। তবে পরোক্ষ সূত্র থেকে বা নন্দলালের লেখায় জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ 'চয়নিকা'র কবিতাগুলি তাঁকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। আর সেই সব কবিতা রবীন্দ্রনাথের 'পড়বার ভঙ্গীতেই' নন্দলালের মনে নানান ছবি ভেসে উঠেছিলো। স্বয়ং কবিকণ্ঠের আবৃত্তি থেকে ফুটে ওঠা সেই সব চিত্রমালা যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছিলেন নন্দলাল। অবশ্য দু-একটা কবিতা আগেই এঁকেছিলেন তিনি, যা পরে ওই কবিতার বইতে সংযুক্ত হয়েছিলো।

আবার নন্দলালের সেই 'যদি মরণ লভিতে চাও' ছবিটি দেখে মনে হয়, এ ছবি বুঝি অনায়াসে রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পের কেন্দ্রিক চরিত্র কাদম্বিনীর অসহায় আত্মহত্যার সার্থক দৃশ্যরূপ হয়ে উঠতে পারে। ওই গল্পের একেবারে শেষে যেখানে কাদম্বিনী 'ওগো, আমি মরি নাই গো, মরি না গো, মরি নাই' —বলিয়া চিৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি দিয়া বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশংকর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।' —ছবিটির সাদা শাড়ির ঘোমটায় ঢাকা এক নারী মূর্তির জলে ডুবে যাবার দৃশ্যটি গল্পের শেষ পর্বের একেবারে কাছাকাছি। অর্থাৎ এখানে এ কথাই বলতে চাই, যে যখনই কোনো সত্যিকার শিল্পী গ্রন্থচিত্রণের ভূমিকা নিয়েছেন, তখনই সে সব ছবির স্বাদ এক ভিন্নতর মাত্রায় পৌঁছেছে। এবং এখানে স্মরণীয়, যে যথার্থ শিল্পী কখনোও লেখকের টেকস্ট্কে হুবহু অনুসরণ করেন না, তিনি লেখকের সেই বর্ণনা অবলম্বনে এক নতুন জগৎ রচনা করেন, যা তখন আর কোনো বিশেষ ঘটনার চিত্রময় বিবরণ হয়ে ওঠে না। শিল্পীর তুলিতে সেই রচনা তখন অনেকটা স্বতন্ত্র এক ছবির নিজস্ব দাবি নিয়ে দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়। সাধারণ ইলাস্ট্রেটর আর প্রকৃত আর্টিস্ট বা স্রষ্টা-এঁদের দুজনের কাজের এই ভিন্নতা বরাবর আমাদের চোখে পড়ে।

'চয়ানিকা'র পরে রবীন্দ্ররচনার উল্লেখযোগ্য চিত্রণের বিষয়ে বলতে গিয়ে নিঃসন্দেহে বলতে হবে 'জীবনস্মৃতি'র কথা। গগনেন্দ্রনাথের অসাধারণ ছবি দিয়ে গাঁথা 'জীবনস্মৃতি' বই খানা এদেশের গ্রন্থ-অলংকরণের ইতিহাসে এক বিশেষ বাঁক ফেরা, একটা জরুরি টার্নিং পয়েন্ট। এবং আগের কথা পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে এখানেও বলতে হয়, গগনেন্দ্রনাথের আঁকা সেই অনন্য চিত্রগুচ্ছকে 'বুক ইলাস্টেশন' বা গ্রন্থ অলংকরণের ছোট্ট সীমানায় কিছুতেই বেঁধে দেওয়া যাবে না। এই সব ছবি রবীন্দ্রনাথের অনুপম স্মৃতিকথার নিষ্প্রাণ বর্ণনামাত্র নয়। বরং বলতে হয়। গগনেন্দ্রনাথের এই ছবি মাঝে মাঝেই যেন এক চিত্রময় প্যারালাল টেকস্ট্ নির্মাণ করে, ছবির সূত্র ধরে পাঠক পৌঁছে যায় ঠাকুরবাড়ির অচেনা অন্দরমহলে। অনেক সময় কেবল ছবিগুলোই সেই ফেলে আসা পর্বের একখানা জীবন্ত অ্যালবাম হয়ে ওঠে।

রবি ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি' হলো লিখিয়ে রবিকাকা আর ছবি-আঁকিয়ে ভাইপো গগনের এক অসাধারণ যুগলবন্ধী। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পর্বের প্রাক্কালে শব্দের ছবি আর রেখার ছবি দিয়ে মুড়ে দেওয়া এই স্মৃতিকথা পাঠকের তথা দর্শকের কাছে এক বিচিত্র রূপকথার মতো। আর গগনেন্দ্রনাথের তুলিতে, রেখা ও আকারের সজীবতায়, আলো-আঁধারির দৃশ্যরূপে তা হয়ে উঠেছে সত্যিকারের এক খানা খাঁটি 'রূপ - কথা'। 'জীবনস্মৃতি'তে ছবির মেজাজে চীনে-জাপানি ছবির প্রভাব খালি চোখেই ধরা পড়ে। জোড়াসাঁকোর শিল্পের আবহাওয়ায় এই 'জাপান কানেকশন' গোড়া থেকেই যথেষ্ট জোরদার। একটু পিছনের দিকে তাকালেই দেখা যাবে, ১৯০৩ নাগাদ টাইকান ও হিজহিদা নামে দুজন শিল্পীকে ওকাকুরা এদেশে পাঠিয়েছিলেন। এই শিল্পীরা গগনেন্দ্রনাথের অতিথিরূপে জোড়াসাঁকোয় কিছুকাল বাস করে শিল্পীদের কালি-তুলির কাজ শিখিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের ধাক্কায় গড়ে ওঠা 'বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট' -এর প্রেক্ষাপটে এই সব জাপানি শিল্পীদের ভূমিকা নিয়ে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পিতৃস্মৃতি' বইতে লিখেছেন—

'বিশ শতকের গোড়ার দিকে ওকাকুরা দুজন তরুণ জাপানি আর্টিস্টকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। গগনদার অতিথিরূপে তাঁরা কলকাতায় থেকে যান। মেঝের উপর বসে তাঁরা যখন রেশমের থানের উপর তুলি দিয়ে রেখা টেনে ছবি সৃষ্টি করতেন, সে এক দেখবার মতো ব্যাপার ছিল। যেমন ক্ষিপ্র তেমনি নিপুণ ছিল তাঁদের কালিতুলির কাজ— সে কাজ দেখার জন্য সমস্ত বাড়ির লোক ভেঙে পড়ত। এই দুজন চিত্রকরের মধ্যে একজন ছিলেন টাইকান— ইনি বর্তমানে জাপানের বিখ্যাত বিজিৎসুইঙ স্কুলের অধিনেতা। গগনেন্দ্রনাথের প্রথম যুগের আঁকা ছবি দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর উপর জাপানি চিত্রশৈলীর প্রভাব গভীর হয়ে পড়েছিল। জাপানি চিত্রশিল্পের প্রতি এই গভীর অনুরাগবশত অনেক কাল পরে বিচিত্রা ক্লাবের তত্ত্বাবধানে কাম্পো আরাইসান নামে আর একজন জাপানি আর্টিস্ট কলকাতায় আসেন জাপানি প্রথায় ছবি আঁকা শেখবার জন্য।'

রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন, এই দুজন জাপানি চিত্রকরের তুলির টানে গগনেন্দ্রনাথও আকৃষ্ট হয়েছেন, যদিও সে সময় তিনি নিতান্তই 'শখের আর্টিস্ট, কালেভদ্রে এক-আধটা ছবি আঁকেন।' রথীন্দ্রনাথ সে লেখায় আরোও বলেছেন যে ১৯০৯ সালে তিনি যখন আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যা শিখে ফিরে আসেন, তখনোও গগনেন্দ্রনাথ সে

ভাবে ছবি আঁকা শুরু করেন নি। রথীন্দ্রনাথের কথায় 'জীবনস্মৃতি'তে ছবি আঁকার আগে পর্যন্ত গগনেন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভা যেন 'ঠিক স্ফূর্তি পায় নি। সেই সময় বাবার লেখা জীবনস্মৃতি ধারাবাহিকভাবে (প্রবাসী পত্রিকায়) প্রকাশিত হচ্ছে। আমি এই বইয়ের জন্য তাঁকে ধরি ছবি এঁকে দিতে। এই ছবিগুলির দ্বারাই বোধ করি তাঁর শিল্প-খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।' অর্থাৎ সেদিক থেকে জীবনস্মৃতির চিত্রমালা আরেকটি জরুরি ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। রথীন্দ্রনাথের অনুরোধে এই সিরিজের ছবিগুলি গগনেন্দ্রনাথ রচনা না করলে, আমরা পরবর্তী কালের একজন অসাধারণ চিত্রকার— চিনি আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম পুরোধা পুরুষ— এমন শিল্পীকে পেতাম কিনা সন্দেহ।

অভীক কুমার দে, তাঁর 'রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ' বইতে আমাদের জানিয়েছেন স্বয়ং 'রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে এই বইয়ের জন্য ছবি এঁকেছিলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।' যদিও একটু আগেই আমরা দেখলাম, রথীন্দ্রনাথের 'পিতৃস্মৃতি' এ ব্যাপারে অন্য কথা বলে। অবশ্য সে সব তর্কে না গিয়ে বলতে হয়, গগনেন্দ্রনাথের আঁকা এই দু-ডজন ছবি যে কোনো শিল্পীর পক্ষেই বিশেষ আত্মশ্লাঘার বিষয় হতে পারে। কালিতুলির আশ্চর্য টানে আঁকা এই সব ছবির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ না করলে প্রসঙ্গটি অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। সে ছবিগুলি হলো, শিকড় বেরিয়ে পড়া ঝুরি নামানো প্রাচীন বট, আবছা আলোয় রেলিঙের ধারে বসে দাসীদের সলতে পাকানোর দৃশ্য, শহরের সারি সারি ছাদের মাথায় মেঘে ঢেকে যাওয়া আকাশ, বাড়ির ছাদের মাথার উপর থেকে দেখা নারকেল পাতার ফাঁকে চাঁদের স্নিগ্ধ রূপোলি আলো, এক্কা গাড়ি, গরুর গাড়ি ও ঝাঁকামুটেসহ মানুষজন মিলে শহরের রাজপথের ব্যস্ততা, আলোছায়ায় ঘেরা বাড়ির ভিতরের বাগান, 'লীলাময়ী মুনিকন্যাদের মতো' উচ্ছল ঝর্ণা ইত্যাদি একাধিক ছবি পাঠক তথা দর্শকের চোখে যেমন অলৌকিক মায়ার জগৎ তৈরি করে।

'চয়নিকা'র মুদ্রিত ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ খুশী হতে পারেন নি, বরং বলা যায় কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন তিনি। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে ছবির বিষয়ে জানিয়েছিলেন 'নন্দলালের পটে যে রকম দেখেছিলুম বইয়ে তার অনুরূপ রস পেলুম না। বরঞ্চ একটায় খারাপই লাগল।' কিন্তু জীবনস্মৃতির মুদ্রিত ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয় বেশ খুশি হয়েছিলেন। চিঠিপত্রের কোনো কোনো টুকরোয় ধরা আছে তাঁর সেই খুশির খবর। যেমন, একটি চিঠিতে মণিমালা গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখেছেন— 'গগনের এই ছবিগুলি যে আমার জীবনস্মৃতির সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে জড়িত হয়ে রইল, এতে আমি ভারি আনন্দবোধ করছি।' আবার বিদেশ থেকে অসিত হালদারকে জানাচ্ছেন— 'গগন আমার বইয়ের যে ছবি এঁকেছেন সকলেই তার প্রচুর প্রশংসা করেছেন।' এই সকলের মধ্যে তো তিনি নিজে আছেনই। আর আমেরিকা থেকে লেখা এ চিঠির 'সকলেই' চিহ্নিত শব্দটি নিঃসন্দেহে বিদেশী দর্শকের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

জীবনস্মৃতির চিত্রময় আত্মকথায় রবীন্দ্রনাথের ছবি-ভাবনার একটা আবছা রেখাও যেন ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে থাকে। লেখার গোড়াতেই তিনি পাঠকের উদ্দেশ্যে বলে রেখেছেন, এই লেখা আসলে 'ছবি আঁকা, ইতিহাস লেখা নয়'। এবং লেখাটিতে বার বার দেখা দেয় ছবির চিত্রকল্প, ঘুরে ফিরে আসে বর্ণিকাভঙ্গের আভাস। এই লেখায় নিজের জীবনপটের নানান বিচিত্র ঘটনার ছবি যেন শব্দের আলো-আঁধারিতে সাজিয়ে নিয়ে গড়ে তুলেছেন এক খানা ছবির গ্যালারি। আর সেখানে এক 'অদৃশ্য চিত্রকরের স্বহস্তের রচনা'য় 'যাহা কিছু ঘটিতেছে, তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য' সেই চিত্রকর 'তুলি হাতে বসিয়া নাই।' সেই অদৃশ্য আর্টিস্ট, সে 'আপনার অভিরুচি-অনুসারে' গ্রহণ ও বর্জনের স্বাধীনতা নিয়েছে। কখনো ছোটোকে বড় করেছে, কখনো বা বড়কে ছোটো করতে দ্বিধা করেনি। এবং অদৃশ্য আর্টিস্টের রচিত সে সব ছবির 'নানা জায়গায় যে নানা রঙ পড়িয়াছে, তাহা বাহিরের প্রতিবিম্ব নহে— সে -রঙ তাহার ভাণ্ডারের'। তিনি এখানে আরোও জানিয়ে রেখেছেন, যে নিজের রসে, নিজের মতো করে গুলে নেওয়া সেই রঙ দিয়ে শিল্পীর চিত্রপটে যে ছবি আঁকা চলেছে তা 'আদালতে সাক্ষ্য দিবার কাজে লাগিবে না'। অর্থাৎ এখানে বোধ করি বলতে পারি, যে রবীন্দ্রনাথের এই আত্মকথা একদিকে যেমন ইতিহাসের ক্রম মেনে চলার দায় থেকে অনেকটা মুক্ত, তেমনি এর সঙ্গে গগনের আঁকা ছবিগুলিও রিয়েলিস্টিক ছবির শর্ত মেনে চলবার দায় স্বীকার করে না। কেবল তাই নয়, লেখার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছবির রচনা করে ঘটনার হুবহু অনুসরণের দায়ও শিল্পীর নেই।

জীবনস্মৃতির পর অনিবার্য ভাবেই এসে দায় 'দি ক্রিসেন্ট্ মুন' -এর প্রসঙ্গ। অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, নন্দলাল আর অসিত হালদারের আঁকা ছবিতে শোভিত হয়েছে এ বই। আর ঘন নীলের উপর সোনালি রঙে 'এম্বস' করে তৈরি হয়েছে বইটির প্রচ্ছদ, প্রচ্ছদের শিল্পী স্টার্জ ম্যুর। বইয়ের ভিতরে চার জন বিশিষ্ট চিত্রকরের আঁকা আটটি রঙিন ছবি নিঃসন্দেহে এ বইটিকে এক অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। প্রত্যেক শিল্পী এ গ্রন্থে দুটি করে ছবি রচনা করেছেন। এবং বলতে দ্বিধা নেই, সদ্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত লেখার সঙ্গে গাঁথা বাংলার এই চিত্রকলা— একই সঙ্গে পৌঁছে গিয়েছে সমগ্র বিশ্বের দরবারে। সেদিক থেকে অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত তৎকালীন নব্য বঙ্গীয় ছবির আন্দোলনেও এই চিত্রশোভিত বইটির ভূমিকা বড় একটা কম নয়। বইটির মুখপাতের বিখ্যাত ছবিটি— 'জগৎ - পারাবারের তীরে' —অবনীন্দ্রনাথের আঁকা, যদিও ভুলক্রমে বইতে সেটি ছাপা হয়েছিলো নন্দলাল অঙ্কিত ছবি হিসেবে। তবে 'চিত্রাঙ্গদা'র পর আবার এখানে পাওয়া গেল অবনীন্দ্রনাথকে, যদিও এই অবনীন্দ্রনাথ আর 'চিত্রাঙ্গদা'র সেই অবনীন্দ্রনাথে বিস্তর ফারাক। এই অবনীন্দ্রনাথের তুলিতে লেগেছে সেই জাদুকাঠির ছোঁয়া, যা তাঁর ছবিতে রচনা করে এক রূপকথায় মোড়া মায়া জগতের। পূর্ব -পশ্চিমের সম্মিলিত অলৌকিক রসায়নে জারিত সংশ্লেষিত হয়ে তখন দেখা

দিয়েছে তাঁর চিত্রকলার স্বভূমি। 'দি ক্রিসেন্ট মুন' -এ অবনীন্দ্রনাথের এই ছবিটি অনেকটা জাপানি স্ক্রোলের মতো, চাপা সোনালি দ্যুতির আভায় মাখনো বাদামি সমুদ্রতটে লাল জামা পরে এক নগ্ন শিশু। তার পায়ের কাছে বালির ওপর আছড়ে পড়েছে রূপোলি ঢেউয়ের রাশি। আর দূরদিগন্তের বালুকা, বেলায় ঘিরে থাকা বঙ্কিম সীমারেখার ওপারে রুপোলি ফেনার মুকুট পরে, ঘন নীল সমুদ্রে উচ্ছ্বল একফালি তরঙ্গমালা। এই বহু মুদ্রিত ও বহুচর্চিত ছবিটির বিষয়ে অবশ্য নতুন করে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। যদিও অভীককুমার দে তাঁর 'রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ' বইতে এ ছবিটির বর্ণনা দিতে গিয়ে দিগন্তরেখার পারে সফেন সমুদ্রকে 'নীল দিগন্তে সাদা মেঘপুঞ্জ' মনে করেছেন। যা বাস্তবিক সমুদ্রের ঢেউ ছাড়া আর কিছু নয়। 'দি ক্রিসেন্ট্ মুন' বইতে 'দি হোম' কবিতার সঙ্গে নন্দলালের আঁকা মা ও শিশুর ছবিটি একটি বিশেষ কারণে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। নন্দলালের এ ছবিতে উজ্জ্বল লাল রঙের দ্বিমাত্রিক প্রেক্ষাপটে, মা আর ছেলের ফিগারের ফর্মের যে সরলতা ও তুলির আঁচড়ে সহজ সপাট স্বতঃস্ফূর্তির প্রকাশ ঘটেছে— তা নিঃসন্দেহে লোকশিল্পীদের কজের সঙ্গে তুলনীয়। সেই পর্বের নন্দলালের ছবির ফর্ম্ ও তুলির টানে পটচিত্রের সারল্যের সূত্রপাত সম্ভবত এ ছবিতেই ঘটেছে। স্মরণ করা যেতে পারে, স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ছেলেভুলানো ছড়া, আলপনা, লোকগাথা ইত্যাদি সংগ্রহের এক বিপুল প্রয়াস দেখা দিয়েছিলো। সেই সময় বাংলার পটচিত্র সংগ্রহের চেষ্টাও হয়েছিলো, আর সেই পটের ছবি থেকে রসদ নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ নিজে কিছু পরীক্ষা -নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন এবং ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। নন্দলালের এই ছবিটি বোধ করি সেই পর্বেরই একটি নমুনা বিশেষ। এবং সেদিক থেকে বিচার করলে, এ ব্যাপারে সবচেয়ে জনপ্রিয় শিল্পী যামিনী রায়ের অনেক আগেই অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যেরা বিশেষত নন্দলাল, লোকশিল্পের দিকে ঝুঁকেছিলেন। অথচ এ বইতে নন্দলালের অন্য ছবি 'দি হিরো" — তার আঙ্গিক ও শৈলীতে একেবারে ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করে। ওয়াশ ও টেম্পারা পদ্ধতির মিশ্রণে আঁকা এই ছবিটির গায়ে বাংলা কলমের সুস্পষ্ট টিপছাপ থাকলেও, চিত্রবিন্যাসে নন্দলালের রেখা ও আকার মাত্রিক বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন সহজেই ধরা পড়ে। বইয়ের অপর দুই চিত্রী অসিত হালদার ও সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর ছবিগুলি শিল্পীদের নিজস্ব মান বজায় রেখেছে।

'দি ক্রিসেন্ট মুন' -এর পর রবীন্দ্ররচনার উল্লেখযোগ্য চিত্রণের কথা বলতে গিয়ে স্বভাবতই মনে পড়বে অবনীন্দ্রনাথের আঁকা 'দি প্যারট্স ট্রেনিং' বইয়ের জন্য সেই অসাধারণ রেখাঙ্কন। এখানে স্মরণে রাখতে হয়, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কারোত্তর পর্বে, তখন পর পর রবীন্দ্ররচনার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়ে চলেছে পত্রিকায় বা স্বতন্ত্র গ্রন্থের আকারে। মডার্ন রিভিউ পত্রিকার ছাপা হচ্ছে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত 'জীবনস্মৃতি'র ইংরেজি অনুবাদ, সঙ্গে মুদ্রিত হচ্ছে গগনেন্দ্রনাথের সেই ছবিগুলি। কিন্তু পরবর্তী রবীন্দ্র কাব্যসংকলন 'স্ট্রে বার্ড্স্' -এ মুদ্রিত বিদেশী চিত্রকরের ছবিটির বিষয়ে তেমন করে কিছু বলার নেই।

তবে ১৯১৮ সালে স্বয়ং রবি ঠাকুর -কৃত তোতা কাহিনী'র অনুবাদ 'প্যারট্স্ ট্রেনিং' -এর সঙ্গে প্রকাশিত অবনের আটটি ছবি বইটির ভিতরের কথাকে সে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছে— তা আর কোনো রসিক শিল্পীর পক্ষে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিলো কিনা, সে বিষয়ে তর্ক উঠতে পারে। বইয়ের গোড়াতেই বর্শার ফলা গেঁথে ফেলার মতো কলমবিদ্ধ পাখির ছবিটি যে ভাবে আঁকা হয়েছে, তা যে কোনো পাঠক-দর্শককে হন্ট্ করতে বাধ্য। অসাধারণ ক্যালিগ্রাফির আঁচড়ে আঁকা হয়েছে এ ছবি— যেখানে 'তোতা কাহিনী'র অন্দরের কথাটুকু পাঠকের মনের মধ্যে যেন এক লহমায় ভেসে ওঠে। ঘন নিরেট কালো দিয়ে জমাট বাঁধা রঙে অনেকটা কার্টুনের মতো করে আঁকা বড় মাথাওয়ালা পণ্ডিতের ছবিটিও বেশ আকর্ষণীয়— পণ্ডিতের শরীরের ফর্ম্ -এর মধ্যে ফুটে ওঠা এক অদ্ভুত স্যাটায়ার, আমাদের অনেক কিছু জানিয়ে দেয়। আর ছবিটির উপস্থাপনার ভঙ্গীতে, সাদা পটের ওপরে ফাঁকা স্পেস জুড়ে ছবির বিষয় বা অবজেক্টটি যেভাবে বিন্যস্ত—তা নিঃসন্দেহে আবার আমাদের দূর-প্রাচ্যের ছবির কথা মনে করায়। এছাড়াও পাখির খাঁচার ছবি, পুঁথির পাতায় কলমের দাপাদাপি, লোহার শিকলে বাঁধা অসহায় তোতা অথবা অতি কষ্টে শরীরের মধ্যপ্রদেশে লাগাম পরানো রাজার নিষ্কর্মা অলস ভাগ্নে ইত্যাদি প্রত্যেকটি রেখাঙ্গনে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব টিপছাপ উজ্জ্বল হয়ে আছে। সব শেষে রাজামশায়ের নিষ্প্রাণ কঠিন জ্যামিতির মতো যান্ত্রিক আঙুল দিয়ে পাখিটিকে পরীক্ষা করে দেখার ভঙ্গীটিও অনবদ্য।

এ পর্বের সমস্ত ড্রয়িং-এই সরলরেখার নির্মম কাঠিন্য সচেতন ভাবে শিল্পীর কলমে বার বার ঘুরে আসে। সাদা কালোয় আঁকা স্ট্রেট্ লাইন নির্ভর ছবি এক প্রকার স্টিফ রিজিডিটি গল্পের আঁতের কথাকে মুহূর্তে বাইরে টেনে আনে। এ ছাড়াও ছবিটিতে রাজার পোশাক - আশাক, মাথার মুকুট, সরু পিলারের মতো উঁচু টেবিল, রাজার কাপড়ের শক্ত ভাঁজ ইত্যাদি কস্টিউম পরিকল্পনার বিচিত্র ধরনে 'তোতা কাহিনী'র রাজা আর পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের কলমে রচিত 'তাসের দেশ' -এর রাজা যেন মুহুর্তে একাকার হয়ে যায়। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির আকারে ও রেখায় এই তীক্ষ্ণতা এবং স্পেস-বিভাজনের বিশেষত্ব এর আগে তেমন চোখে পড়ে না - যা আমাদের একটু অবাক করে বৈকি! এমন কি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে 'বাই হাউস' -এর প্রদর্শনী তখনোও কোলকাতায় এসে পৌঁয়ায়নি, তাই সহজেই সমসাময়িক আধুনিক পাশ্চাত্য ছবির সঙ্গে এসব নিরেট শক্ত তীক্ষ্ণ জ্যামিতিক ড্রয়িঙের সূত্র টেনে দেওয়া যায় না, তাহলে অতি সরলীকরণ করে ফেলা হবে। আর কলাভবনের প্রতিষ্ঠা তখনো সুস্পষ্ট ভাবে হয় নি। সেক্ষেত্রে আমার

মনে হয়, 'তোতা কাহিনী'র ভিতরের রস টেনে বের করে আনার জন্য অবনীন্দ্রনাথ বইটির ছবির ব্যাপারে বাংলা দেশের লোক শিল্পের দিকে চোখ মেলেছিলেন। আগেই বলেছি, স্বদেশীয়ানার প্রভাবে বিশ শতকের গোড়া থেকেই কাকা ভাইপোদের মধ্যে আলপনা, পট, ছেলেভুলোনো ছড়া, বাংলার নানান ব্রতকথা সংগ্রহের পাশাপাশি চলছিলো লোকায়ত সব হরেক উপকরণ যোগাড় করার কাজ। তাই মনে হয়, এখানে বাংলার কাঠের পুতুলের আদলে অবনীন্দ্রনাথ তৈরি করেছেন রাজার কস্টিউম— আর সেই রোবটের মতো ভঙ্গী, যা আপাতভাবে সেই সময়ের কিউবিস্টিক ছবির ধরন-ধারণের সঙ্গে যেন অনেকটা মিলেমিশে যায়, দৃশ্যত পশ্চিমের কন্টেম্পোরারি আর্ট সিনারিয়োর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের এই রেখাঙ্কনগুলি যেন একাকার হয়ে ওঠে। আমাদের মনে হয়, 'প্যারট্স্ ট্রেনিং' -এর চিত্ররূপ নিঃসন্দেহে এ দেশের গ্রন্থচিত্রণের জগতে এক বিশেষ মাত্রা স্পর্শ করে যেখানে লেখা আর রেখা কেউ কারোর থেকে পিছিয়ে পড়তে রাজী নয়। একে অপরের সঙ্গে সমানে সমানে পাল্লা দিয়ে চলে। এদিক থেকে ভেবে দেখলে কাকা আর ভাইপো, দুজনের দুই স্বতন্ত্র ভুবনে তাঁদের উভয়ের সৃষ্টিই বুঝি মাধ্যমের স্বতন্ত্র শৈলীর অভিনবত্ব তথা উৎকর্ষের তুলাদণ্ডকে একটি নিশ্চিত সরলরেখায় স্থির ভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে।

রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে ছবি দিয়ে গাঁথা পরবর্তী উল্লেখ্য বইটির নাম 'গীতাঞ্জলি এ্যান্ড ফ্রুট্-গ্যাদারিং'। এই বিশেষ সচিত্র সংস্করণে তেইশটি সাদা - কালো ছবি ও আটটি রঙীন ছবি মুদ্রিত হয়েছে। 'ক্রিসেন্ট মুন' -এর শিল্পীরা, যেমন অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদার তো এখানে আছেনই, এছাড়াও এখানে শিল্পী হিসেবে যোগ দিয়েছেন সুরেন্দ্র কর এবং গগনেন্দ্রতনয় নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই বইয়ের যে কয়েকটি ছবি আলাদা ভাবে নজর কাড়ে, তার মধ্যে নন্দলালের আঁকা 'বাউল', অবনীন্দ্রনাথের 'শিকলে বাঁধা বন্দী' বা 'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি' কবিতা অবলম্বনে আঁকা ছবিতে অস্থির নাটকীয় ভাব দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এছাড়াও 'ভোরের পাখি ডাকে কোথায়' ছবিটিও এক অন্য অবনীন্দ্রনাথের সন্ধান দেয়। উল্লেখ্য, বইয়ের দুটি ছবিতে প্রচ্ছন্ন আছে যীশুখ্রীষ্ট ও বুদ্ধের ইমেজ— যা আন্তর্জাতিক পাঠকের কথা ভেবে সচেতন ভাবে আরোপিত বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রসাহিত্য চিত্রণের দ্বিতীয় অধ্যায় গড়ে উঠেছে বিশের দশকের একেবারে গোড়ায়। এ পর্বে অনেকগুলি জরুরি ঘটনার সূচনা দেখা দিয়েছে। কলাভবনের গোড়া পত্তন ঘটেছে এই সময়েই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রাণের কলাভবন তার নির্মাণ পর্বেই হারিয়েছে আশ্রমের চিত্রশিক্ষক অসিত হালদারকে। অসিত কলাভবন থেকে কাজ ছেড়ে চলে যাবার পর নন্দলালের ওপর বর্তেছে কলাভবনের দায়িত্ব। আর আমরা জানি সে কাজও খুব সহজে হয়নি। শান্তিনিকেতনে নন্দলালের যোগদানকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ—কাকা ভাইপোর মধ্যে কিছুটা মান- অভিমানের পালাও ঘটে গিয়েছে। এবং শুধু সেই কথাই নয়, ছবি-আঁকিয়ের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশও দেখা দিয়েছে এই বিশের দশকে। একদা 'যদি চিত্রকর হতেন, তাহলে দেখিয়ে দিতেন কি করতে পারতেন' — তাঁর সেই চিত্রকর হয় ওঠার বাসনা এক সময়ে ক্রমশ পল্লবিত হয়ে উঠেছে। কবিতার কাটাকুটিকে ঘিরে কলমের আঁকিবুকিতে নকশার উপস্থিতি রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপিতে দেখা গেছে বারবার, তবে এই পর্বে সেই আঁকিবুকির নকশারও কিছুটা দিক্‌বদল ঘটেছে। নেহাত দৃষ্টিনন্দন অলঙ্কারবহুল কাটাকুটির নিরীহ নকশাগুলো এ পর্বে ক্রমে হয়ে উঠেছে কাঁটাওয়ালা খোঁচাওয়ালা অদ্ভুত সব বিকটদর্শন জীব - জন্তুর ভয়ানক আকারে।

এখানে বলাবাহুল্য, ক্রমে রবীন্দ্রনাথের এই নতুনতর চিত্রভাবনার বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্য চিত্রণের পথটির কিছুটা হলেও দিকবদল ঘটেছে বৈকি! তার রবীন্দ্রপাণ্ডুলিপি কাটাকুটিতে এই দিকবদলের প্রথম চিহ্ন সম্ভবত দেখা দিয়েছে 'রক্তকরবী'র খাতায়, এবং অব্যবহিত পরে 'পূরবী'তে এই নকশা আরো প্রবলভাবে জোরদার, আরো বিচিত্র ও আকর্ষণীয়। 'পূরবী'র সেই আশ্চর্য কাটাকুটির অনেকটি আজ আজ আমাদের চোখের সামনে এসেছে, এই ছবিতে মোড়া সম্পূর্ণ খাতাটিরই 'ফ্যাক্সিমিলি এডিসন' যথাযথ ভাবে প্রকাশ হওয়া বিশেষ জরুরি। যদিও পূরবী'র শেষ বসন্ত' নামক একটি কবিতার চিত্রিত টুকরো আমরা একাধিক বার মুদ্রিত হতে দেখি। অদ্ভুত স্থাপত্যের মতো কাটাকুটির বুনোটে ঘেরা ছবিসহ সেই কবিতাটির অংশ 'বেণুবনচ্ছায়াঘন সন্ধ্যায়/ তোমার ছবি দূরে/ মিলাইবে গোধূলির বাঁশরীর'/ সর্ব্ব শেষ সুরে' — ২১ নভেম্বর ১৯২৪ তারিখে, বুয়েনোস্ এয়ারিসে লেখা। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে এর দুদিন আগেই তিনি উরুগুয়ের এক বিশিষ্ট শিল্পী পেদ্রো ফিগারির ছবির প্রদর্শনী দেখে এসেছেন। ভ্রমণসঙ্গী এলম্‌হার্স্টে'র বর্ণনায় সে ছবি অসীম বিষাদের ছায়ায় আচ্ছন্ন, রবীন্দ্রনাথের ওই কবিতা মাখানো ছবিতে কি ঘটে গেলো তার কোনো প্রতিফলন?

১৩৩১ -এর আশ্বিনে পত্রিকায় যখন 'রক্তকরবী' মুদ্রিত হচ্ছে, তখন নাটকের একেবারে শেষে রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপির কাটাকুটি আশ্রিত জ্যামিতিক নকশা ছাপা হয়েছিলো। সে দিক থেকে দেখলে 'রক্তকরবী'র সঙ্গে সেইটিই প্রথম প্রকাশিত ছবি— যা নাটকের স্রষ্টারই হাতের রচনা। পরে অবশ্য প্রবাসীর পক্ষে থেকেই প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'রক্তকরবী'তে গগনেন্দ্রনাথের ছবি ব্যবহৃত হয় এবং সেখানেও রবীন্দ্রনাথের কাটাকুটির ছবি সংযুক্ত থেকেছে। রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য নাটকটিকে ঘিরে ছবি রচনা ছাড়াও মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রেও যে গগনেন্দ্রনাথের বিশেষ ভাবনা ছিলো। তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই 'রক্তকরবী'র সঙ্গে গগনের নাম একেবারে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে।

'রক্তকরবী'তে লেখা আর ছবি যেমন আশ্চর্য যুগলবন্দী, তেমনি একেবারে ভিন্নধর্মী রচনার ছবির জন্য 'নটরাজ

ঋতুরঙ্গশালা'য় নন্দলালকে ছাড়া সত্যিই ভাবা যায় না। এ বইটি সাজানোর বিষয়ে যথার্থ অর্থেই অলঙ্করণ শব্দটি ব্যবহার করতে হয়। বই তৈরির ক্ষেত্রে আজকে যে শব্দগুলি ঘুরে ফিরে বার বার আমাদের কানে আসে সেই 'পেজ লে-আউট', 'পেজ মেক-আপ' ইত্যাদির কাজ এখানে অসম্ভব দক্ষতার সঙ্গে করা হয়েছে? বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছবির বৈচিত্র লক্ষ্য করার মতো, কোথাও ক্যালিগ্রাফির সপাট আঁচড়ে রচিত হচ্ছে সাজেস্টিভ ছবির অসাধারণ উদ্ভাস, কোথাও আবার ডেকরেটিভ আমেজের মাখা দৃষ্টিনন্দন রেখায় তৈরি ছবিতে মুগ্ধ হয়ে উঠছে পাঠক বা দর্শকের দুই চোখ। 'প্রত্যাশা', 'দীপালি', 'শরতের ধ্যান', 'বৈশাখ-আবাহন' বা শিমুল ফুলের ছবি তাদের টান-টান ঋজুতায় যেমন মনকে আকর্ষণ করে, তেমনি এর পাশাপাশি 'বসন্ত' 'দোল' 'শরৎ' ইত্যাদি অজস্র রেখাঙ্কন, পুষ্পিত পলাশের গুচ্ছ বা ফুটন্ত অশোকের মঞ্জরী তাদের আলঙ্কারিক মাধুর্যে চোখকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়। এবং সেদিক থেকে দেখতে গেলে এ বইয়ের চিত্রমালা নন্দলালের শিল্প-বৈশিষ্ট্যের সমস্ত দিকগুলি আশ্চর্য রকম ভাবে প্রতিফলিত করে!

এর পরে শান্তিনিকেতন বৃত্তের একটু বাইরের শিল্পী হিসেবে এখানে দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর কথা অবশ্যই বলতে হয় 'শেষের কবিতা' চিত্রিত করার জন্য। প্রবাসী পত্রিকায় 'শেষের কবিতা' ছাপা হয়েছে ১৩৩৫-এর ভাদ্র থেকে ঐ বছরের শেষ অর্থাৎ চৈত্র পর্যন্ত। এ লেখার সঙ্গে দেবীপ্রসাদের ছবিগুলির একেবারেই অন্য ধাঁচের—রবীন্দ্ররচনায় এমনতর রিয়েলিস্টিক ঘরানার ছবি বোধ হয় এই প্রথম তাঁর লেখার সঙ্গে পরিবেশিত হলো। দেবীপ্রসাদের ছবি গল্পের বর্ণনাধর্মী নাটকীয়তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছে। এবং সেখানে খুটিনাটির দিকে বেশি নজর দেওয়ার, ছবিগুলির আলোছায়া মাখা রিয়েলিস্টিক ভঙ্গী সত্ত্বেও সেগুলি অনেকটা নিষ্প্রাণ বিবরণ বলে মনে হয়।

এখানে রবীন্দ্রনাথের আঁকা কয়েকটি প্রচ্ছদের কথা আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে। বিশের দশকের সূচনায় কবিতার পাতায় কাটাকুটি দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে ছবির জগতের একেবারে দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এমন একটা সময়ে তাঁর হাতে রচিত হলো 'মহুয়া'র প্রচ্ছদ। সরলরেখা ভিত্তিক তীক্ষ্ণ ধাতব পাত্রের মতো জ্যামিতিক অক্ষরের উল্লম্ব নির্মাণে দৈরি হয়েছে 'মহুয়া'র কভার। জমাট বাঁধা ঘন কালো নিরেট অন্ধকারের প্রেক্ষাপট থেকে রূপোলি বিদ্যুতের মতো ঋজু রেখায় টানা এই অক্ষরমালা, তাঁর সেই সময়ের পাণ্ডুলিপির কাটাকুটির সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে। 'মহুয়া'র জন্য আঁকা আর একটা ছবিতে রঙের ব্যবহার অনেক জোরালো। সম্ভবত সেই ছটি দেখেই রামকিঙ্কর এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন— 'রবীন্দ্রনাথের ছবিতে রঙের ব্যবহার দারুণ। ন্যাচারাল কালোর আনবার চেষ্টা করেছেন। ''মহুয়া''র কভারের ছবির রঙ দেখবেন। ঠিক যেন মৌফুলের রঙ। খুব কড়া অবজার্ভেশন ছিল কিন্তু।'

'মহুয়া'র পাশাপশি রবীন্দ্রনাথের আঁকা আরো কয়েকটি প্রচ্ছদের কথা এখানে বলতে হয়। সেগুলি হলো 'পরিশেষ', 'বনবাণী','শেষসপ্তক','পুনশ্চ','চার অধ্যায়' বা 'দুই বোন' ইত্যাদি। এর মধ্য 'পরিবেশ' ও 'বনবাণী', 'মহুয়া'র মতো ভার্টিকাল কম্পোজিশান, অক্ষরগুলো সাজানো হয়েছে ওপর থেকে নীচে। অনেকটা চীনে-জাপানি ছবির স্ক্রিপ্ট্ বা ছবিতে শিল্পীকৃত সিগনেচারের আদলে। রবীন্দ্রনাথের এই বিন্যাসের নেপথ্যে দূর-প্রাচ্যের ছবির প্রভাব বিশেষ ভাবে কাজ করেছে বলেই অনুমান করি। এমন কি, একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে, প্রথম পর্বেই ছবিতে তিনি ওই রকম উল্লম্ব স্বাক্ষর করেছেন— এই স্বাক্ষরের ধরনেই অনেক সময় তাঁর ছবির রচনাকাল নির্ণয় করা যায়। তবে 'শেষসপ্তক', 'চার অধ্যায়', 'পুনশ্চ' বা 'দুই বোন' এর অক্ষরের নকশা আগের বইগুলির মতো খাড়াই ডিজাইনে করা হয়নি। আর কেবল অক্ষর এর নকশা গেঁথে নয়, সেদিক থেকে দেখলে 'খাপছাড়া' ও 'সে'র প্রচ্ছদই হলো রবীন্দ্রনাথের হাতে তৈরি পরিপূর্ণ বইয়ের কভার। যা বইটির প্রচ্ছদের সম্পূর্ণ পাতাজুড়ে পরিকল্পিত। 'খাপছাড়া'য় এক সহাস্য মুখমণ্ডলের সঙ্গে গ্রন্থনাম ও লেখকের নাম সাজিয়ে দেওয়া, এবং 'সে' বইয়ের বেলাতেও তাই। 'সে'র দুটি প্রচ্ছদের মধ্যে প্রথমটি পাশ ফেরা এক বিকটদর্শন মূর্তির মুখের প্রোফাইল, বেশ রঙচঙে। কিন্তু পরেরটা অর্থাৎ এখন যেটা পাওয়া যায় তা একটি চাঁদের মতো বৃত্তাকার মুখমণ্ডলে হাসির আভাস। ছোটোদের বইয়ের কভার থেকে বিকটদর্শন প্রোফাইল বাতিল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'গল্পসল্প' ও 'বিচিত্রিতা'র মুখপাতের ড্রইঙ মনে রাখতে হয়। প্রথমটিতে আয়েস করে বসে থাকা একদল মানুষের জটলা আর 'বিচিত্রিতা'র আখ্যাপত্রে রবীন্দ্রনাথের তুলিতে ধরা দিয়েছে বিশেষ এক রাবীন্দ্রিক জান্তব আকারের রেখাঙ্কন— এক পক্ষীমানবের চেহারা যেন!

'বিচিত্রিতা'র প্রসঙ্গ যখন এসেই গেলো, তাহলে 'বিচিত্রিতা'র ছবির কথাও এখানে একটু সেরে নেওয়া যাক। এই কাব্য-সঙ্কলনটিকে বিশেষ ভাবে ছবি দিয়ে মুড়ে দিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এবং এখানেই প্রথম দেখা গেলো, সেই সময়ের অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের ছবির পাশে সাজানো রয়েছে কবির আঁকা ছবিও। অধিকাংশ ছবি এসেছে শিল্পীদের পোর্টফোলিও থেকে, যার অনুপ্রেরণায় রচিত হয়েছে কবিতা। আবার ঘটেছে এর উল্টোটাও, কখনো বা কবিতা অবলম্বনেও তৈরি হয়েছে ছবি। এই পর্বের রবীন্দ্রনাথ শুধু তো কবি নন, রীতিমতো পাকা আর্টিস্ট। দেশে - বিদেশে (বলা উচিত বিদেশ - দেশে) তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছে, চিত্রকর হিসেবে তিনি প্রশংসিত, অভিনন্দিত। স্বদেশে অর্থাৎ কোলকাতাতেও ঘটা করে হয়েছে তাঁর ছবির এক্জিবিশন। এ হেন সময়ে তিনি হয়তো রাজি হলেন তাঁর কবিতার বইতে অন্যদের পাশাপাশি ছবি ছাপতে। 'বিচিত্রিতা'য় রবীন্দ্রনাথের সাতটি ছবি পাওয়া গেল। ওয়াটার প্রুফ কালি আর জলরঙে আঁকা 'পুষ্প', পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাতেই আঁকা 'শ্যামলা', 'একাকিনী' আর 'ঝাঁকড়া চুল', রঙীন কালি

আর জলরঙে 'বিদায়' এবং দুটি ফুলের ছবি, যথাক্রমে 'যুগল' ও 'প্রভেদ'। 'বিচিত্রিতা'য় গগনেন্দ্রনাথের আঁকা ছবির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আটটি ছবিতে গগন তাঁর চিত্রকলার সেই নিজস্ব মায়ালোক সৃজন করেছেন— যা সাদা কালোতে রচিত হয়েও অজস্র বর্ণস্তরের আভাস আনে। এ বইয়ের জন্য তাঁর আঁকা ছবির মধ্যে 'বধূ', 'কুমার', 'মরীচিকা', 'ছায়াসঙ্গিনী', 'ভীরু', 'কালো ঘোড়া' এবং 'দ্বিধা' একই শৈলীতে আঁকা, কেবল 'বেসুর' নামক ছবিটি একটু আলাদা। এ ছবিটি গগনের এই চিত্রমালার পাশে সত্যিই বুঝি অন্যসুরে বাঁধা হয়েছে, হয়তো বা সচেতন ভাবেই করা হয়েছে এই পরিকল্পনা। আশ্চর্যজনক ভাবে 'বিচিত্রিতা'য় অবনীন্দ্রনাথকে তেমন করে পাওয়া গেলো না। 'অচেনা' শীর্ষ কবিতয় টিমটিমে উপস্থিতি আমাদের একটু অবাক করে বৈকি! আর এখানে মুদ্রিত অবনের ছবিটি অনেক পুরোনোও। জানিনা কেন 'বিচিত্রিতা'য় অবনের রিপ্রেজেন্টেটিভ ছবির সন্ধান মিললো না। ছবি ছাপানো নিয়ে 'রবিকা'র সঙ্গে তাঁর কোনো মনান্তর ঘটেছিলো কিনা কে বলবে। তবে অসিত হালদারকে অভিমানের সুরে লেখা একটা চিঠিতে যেন এমনটাই আভাস মেলে। এ সব প্রসঙ্গ থাক। 'বিচিত্রিতা'র অন্যান্য শিল্পীরা ছিলেন নন্দলাল, সুরেন কর, সুনয়নী দেবী, নিশিকান্ত রায়চৌধুরী, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ক্ষিতীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী ও মনীষী দে। এই শিল্পীদের প্রত্যেকটি ছবিই তাঁদের নিজস্ব ঢঙে আঁকা। তবে এর মধ্যে সুনয়নী দেবীর ছবিটির কথা বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য।

'খাপছাড়া' বা 'সে'র কথায় ফিরে আসি। এ বই দুটিতে অবশ্য ছবি এবং টেক্স্ট্ উভয়েরই রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ, আর কোনো শিল্পীর কাজ এখানে নেই। আর এ কথাও সত্যি যে, 'খাপছাড়া' ও 'সে'র মেজাজ বুঝে ছবি আঁকতে পারা সহজ নয়। 'খাপচাড়া'র উৎসর্গপত্রে এবং ভূমিকায় কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর পাগলামির স্বপক্ষে সওয়াল-জবাব চালিয়েছেন অদৃশ্য কোনো প্রতিপক্ষের সঙ্গে অবাক লাগে, যখন দেখি প্রচ্ছদ থেকে শেষের পাতা পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা তাঁর ছবির বিষয়ে একটি কথাও বলেন নি, সে ব্যাপারে তিনি আশ্চর্যরকম নীরব! ছবির ব্যাপারে একটু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এখানে কেবল রবীন্দ্রনাথের ছবিই থাকে এমন পরিকল্পনা বোধকরি গোড়ায় ছিলো না। এ প্সঙ্গে কিশোরীমোহনকে লেখা একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন— 'খাপছাড়া'য় আমার ছাড়া অন্য কারো ছবি নিষিন্ধ হয়েছে। তাই অগত্যা ছবি বানাতে লেগেছি। অনেকগুলোই হয়েছে। আর গোটাকতক হলেই সম্পূর্ণ হয়। দেরি হবে না।' শেষ বেলার এই বদলে যাওয়া সিদ্ধান্তের, তাড়াহুড়োর মধ্যে কবিতার সঙ্গে ছবি সাজাতে একটু-আধটু গোলমাল ঘটে যাওয়া বিচিত্র নয়। যেমন ছড়া ৭৪-এ 'দাঁয়েদের গিন্নি'র মুখটি মহিলার বলে ভাবতে আমদের বেশ অসুবিধা হয়। ভাঙা চোয়ালের প্রায় টাক-মাথা মুখটি পুরুষের বলেই সন্দেহ হয়, শুধু তাই নয়— ছবির গলার কাছে শার্টের কলারের সাজেশন, আর মাথাতেও টুপির আভাস— সব মিলে ছবিটি দাঁয়েদের গিন্নির কখনোই নয়, কর্তার হতে পারে। যদিও এই ছড়াটিতে কর্তাটি প্রায় উহ্যই থেকে যান। 'খাপছাড়া'য় মুদ্রিত অন্যান্য নারীমুখের সঙ্গে এর তুলনা করলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। খটকা লাগে ৪৮ নম্বর কবিতার ছবিকে ঘিরেও। 'কনের পণের আশে চাকরি সে ত্যেজেছে' এই ছড়ার সঙ্গে দেওয়া ড্রয়িংটিতে হিল তোলা জুতো পরে দৌড়ে পালানো মেমসাহেবের যে ভঙ্গী, তাকে এই কবিতার নায়ক হীরুর 'দরবেশ' সাজ মোটেও বলা চলে না। অবশ্য এটি 'কনের বাঁকালো মুখ' হলে অন্য কথা, যদিও হীরুর ছবিই এখানে প্রত্যাশিত। এ সবই বোধকরি ছড়া আর ছবির বদলে যাওয়ার বিড়ম্বনা। ছাপাখানার এই সব ছোটোখাটো গোলমালের পর্ব বাদ দিলে লেখা ও রেখায় 'খাপছাড়া' এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। শুধু ছবিগুলিই কলমের প্রত্যয়ী টানে এমন স্বতঃস্ফূর্ত ও সজীব— তা বলবার নয়! কলমের দ্রুত রেখার কয়েকটি ছবি মাতিসের রেখাঙ্কনকে মনে করিয়ে দেয়। ছবির দিক থেকে 'সে'ও কিছু কম যায় না। এবং 'সে' বইটিতে ছবি নিয়ে কোনো বিভ্রাট ঘটেছে বলে মনে হয় না। স্মরণীয়, 'খাপছাড়া'র মতো 'সে'র উৎসর্গ পত্রের ছবির কথা অনুল্লেখ থেকে যায়নি। 'মনের গহন' থেকে আসা 'খেয়াল-ছবি'র কথা এখানে বলেছেন, বলেছেন 'কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা' ছবির কথা, অর্থাৎ শব্দের ছবি আর রেখার ছবিকে তিনি এই বইতে ঝুলি উজাড় করে মেলে দিয়েছেন— গ্রহণ করার আর না-করার ভার পাঠকের ওপর। পুরে দিদিকে বলা আপাত সরল গল্পের গভীরে এখানে অনেক স্তর, অনেক খাঁজ-খোঁজ আচে, যার সত্যিকারের চাবিকাঠিটি বুঝি বড়দেরই নাগালে। টেকস্ট্-এর কথা রেখে কেবল মাত্র ছবির দিকে তাকালেও 'পাল্লারাম', 'মাস্টারমশায়', 'হৈ রৈ হৈ মারমাট্টা', 'হাঁচিয়েন্দানি কুরুঙ্কুনা', 'সুকুমার', 'পাঁড়েজী', 'ঘন্টাকর্ণ', 'জিব-বের-করা কাঁটাওয়ালা', 'পাতুখুড়োর গিন্নি' ইত্যাদি কোনটাকেই বাদ দেওয়া যায় না। প্রত্যেকটি তাদের আপন মহিমায় উজ্জ্বলভাবে প্রতিষ্ঠিত।

'কবিতা' পত্রিকায় বই দুটির সমালোচনায় বুদ্ধদেব বসু 'খাপছাড়া' আর 'সে'র মধ্যে অবশ্য 'সে'কেই 'ঢের বেশি ভালো' বলেছেন। তাঁর মতে 'খাপছাড়া' পড়তে পড়তে 'আবোল তাবোল' -এর কথা মনে না -হয়েই পারে না, কিন্তু এ-দুটি ঠিক এক জাতের বই নয়। 'খাপছাড়া' মহাকবির অবসরের ফুলকি, 'আবোল তাবোল' ভালো কবির শ্রেষ্ঠ সাধনা।' তবে তাঁর মতে 'সে' বইটি হলো 'অদ্ভুতরসের মাস্টারপীস'। যদিও ছবির ক্ষেত্রে দুটি বইয়ের বিষয়েই তিনি সমান ভাবে উচ্ছ্বসিত, ছবির দিক দিয়ে দুটি বইকেই সমান আসন দিয়েছেন। ছবির বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—

'উভয় গ্রন্থই অকৃপণভাবে চিত্রিত, এবং ছবিগুলো কবিরই হাতের। ছবিগুলোর ড্রয়িঙ -এর কি এ্যানাটমির গলদ তা ওস্তাদরা বার করবেন, এবং তা করতে হলে খুব বেশি ওস্তাদ হতে হয় না বোধ করি, কেননা সেদিক থেকে নিখুঁত হওয়া এদের উদ্দেশ্যই নয়। আমি আনাড়ি হয়ে একটু বলতে পারি যে রচনার রসের সঙ্গে ছবিগুলি অদ্ভুত মিশ খেয়েছে; এবং কোনো কোনো মানুষের ও জীবজন্তুর ছবি অত্যন্ত জীবন্ত, মুখের ভাবটুকু সুদ্ধ।' বুদ্ধদেবের কথার সূত্র

ধরে পুনরায় এখানে বলতে হয়, 'সে' আর 'খাপছাড়া'য় লেখা ও রেখা প্রকৃত অর্থেই আশ্চর্যরকম 'মিশ খেয়েছে'। এই বইয়ের পাতা 'অদ্ভুতরসের মাস্টারপীস' - এ ঘাটতি রয়ে যেতে। এভাবে নিজের লেখাকে ছবিতে সাজিয়েছেন লেখক স্বয়ং, এমন উদাহরণ আমাদের তেমন চোখে পড়ে না, হয়তো আমাদের মনে পড়বে সুকুমার রায়, উইলিয়ম ব্লেক বা অধুনা গুন্টার গ্রাসের কথা।

সব শেষে এই লেখা 'ছড়ায় ছবি' আর 'সহজ পাঠ' দিয়ে শেষ করি।

'ছড়ার ছবি'তে প্রচ্ছদ থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নন্দলাল তাঁর অসাধারণ ছবি আর স্কেচ দিয়ে ভরিয়ে তুলেছেন। বেশি ভাগ ছবি এঁকেছেন রেখাঙ্কনে, এছাড়া কিছু ছবি জলরঙেও আঁকা হয়েছে। কয়েকটি ছবিতে একটু অলঙ্করণের আভাস আছে, তা সত্তেও বেশির ভাগই ছবি নন্দলালের নিজস্ব স্বগীয় দীপ্তিতে ভাস্বর। নন্দলালের ছবির প্রধান বৈশিষ্ট্য তার রেখা ও আকারের ভাস্কর্যসুলভ ঋজুতায়। ছোট্ট একটা ছবিকে আকারে বড় করে তুললেও ছবিটির প্রধান কাঠামো কখনো দুর্বল হয়ে পড়ে না। ছবির ভাষায় যাকে বলে মনুমেন্টাল-কোয়ালিটি। নন্দলালের সমস্ত ছবিতেই এই শিল্পগুণ বর্তমান, ফলে আয়তনে বড় হয়ে উঠলেও ছবির স্থানিক বিভাজনের টান কি অনায়াসে ভাস্কর্যের মন্ডনধর্মী আয়তনের আভাস আনে, তা দর্শকের চোখে প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকে! আর তাঁর তুলির ক্যালিগ্রাফিক আঁচড়ের সজীবতার কথা তো আমরা সকলেই জানি।

এই বইয়ের 'জলযাত্রা', 'পিস্‌নি', 'ভ্রমণী', 'ছবি-আঁকিয়ে', 'পিছু-ডাকা', 'অজয়নদী', 'অচলা বুড়ি','কাশী', 'প্রবাসে','খেলা', 'ঘরের খেয়া', 'বাসাবাড়ি', 'পাথরপিণ্ড' ইত্যাদি প্রত্যেকটি রেখাঙ্কনে শিল্পীর নিজস্ব টিপছাপ লাগানো আছে। আর ড্রাই-পয়েন্টে আঁকা সেই বিখ্যাত ছাগলের ছবি— যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 'উচ্চশ্রবা তেজ' দেখতে পেয়েছিলেন— সেটি বুঝি সকলের চেয়ে আলাদা। 'ছড়ার ছবি'তে আঁকা জলরঙের ছবিগুলি — 'ঝড়', 'পদ্মায়', 'রিক্ত', 'আকাশপ্রদীপ', 'যোগীনদা' বা 'মাধো' — পরিণত নন্দলালের অলৌকিক চিহ্নযুক্ত। তাছাড়া একটু ডেকরেটিভ এলিমেন্ট মাখানো ছবি, যেমন 'আতার বিচি', 'মাকাল', 'আকাশ', 'ভজহরি', 'কাটের সিঙ্গি', 'তালগাছ', 'চড়িভাতি' ইত্যাদি ড্রয়িঙেও শিল্পী তাঁর আশ্চর্য ছাপ অবলীলায় অটুট রেখেছেন। সব শেষে এখানে একটা ব্যাপার কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করার মতো। সেই 'চয়নিকা'য় প্রথমবার রবীন্দ্রগ্রন্থের ছবি আঁকার সময় রচিত একটি ছবিকে নন্দলাল এতদিন পরে 'ছড়ার ছবি'তে প্রায় হুবহু অনুসরণ করেছেন। 'চয়নিকা'র সে কবিতাটি হলো— 'আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিন শেষের শেষ খেয়ায়', আর এখানে কবিতা 'দেশান্তরী'। পাশাপাশি ছবি দুটিকে রাখলে অবাক হতে হয়, ছবি দুটির কম্পোজিশান, মানুষটির ভঙ্গীসহ যাবতীয় ডিটেল একেবারে এক। তফাত কেবল আঙ্গিকের, এখানে ছবিটি রেখাঙ্কনে তৈরি হয়েছে। অজস্র ছবি দিয়ে সাজানো 'ছড়ার ছবি' বইটি হাতে নিয়ে মনে হয় এ হলো কবি ও শিল্পীর এক সার্থক যুগলবন্দী।

এবারে 'সহজ পঠ' -এর কথা। আমার মনে হয়, চিত্রভূষিত বলেই 'সহজ পাঠ'কের রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য চিত্রিত গ্রন্থের পাশাপাশি সাজিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। কারণ 'সহজ পাঠ' -এর ভাবনা, পরিকল্পনা ও প্রয়োজন অন্যান্য রবীন্দ্রগ্রন্থের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে লেখার পাশে নন্দলালকে শুধু ছবি দিয়ে সাজিয়ে দিলেই তাঁর কাজ শেষ হয়নি, সব সময় মাথায় রাখতে হয়েছে যে, মুখ্যত ছোটোরাই এই বইয়ের পাঠক ও দর্শক। তাই কেবল রবীন্দ্রনাথের লেখা অনুসরণ করাই নয়, এর প্রথম প্রায়োরিটি ছোটোরা, তাই ছোটোদের আকর্ষণ করার বিষয়টা অন্যতম প্রধান। এছাড়াও ভাবতে হয়েছে আর্থিক দিকটা, যাতে করে ছবি ছাপানোর জন্য খরচ বেশি না হয়ে যায়। ছাপাখানার বিষয়টা স্মরণে রেখে 'সহজ পাঠ' -এ ছবি হয়েছে রেখাভিত্তিক এবং আকারভিত্তিক, টোন-নির্ভর নয়। লিনোকাট বা উডকাটের অসামান্য নিদর্শন এ বইয়ের প্রথম ভাগের ছবিগুলি। 'ছোটো খোকা বলে অ আ', চরে বসে রাঁধে ঙ' বা 'চ ছ জ ঝ দলে দলে', 'হ্রস্ব উ দীর্ঘ উ' ইত্যাদি রেখাহীন ছবিগুলি যেন, সাদা আর কালোয় আকারের আলোকিত উদ্ভাস। এবং 'সহজ পাঠ', -এর পরবর্তী ভাগে অর্থাৎ ক্রমশ অপেক্ষাকৃত বড়দের জন্য আঁকা ছবিতে চরিত্রের বদল লক্ষ্য করার মতো। দ্বিতীয় ভাগ থেকে এখানে চোখে পড়বে রেখার জয়যাত্রা।

রবীন্দ্রগ্রন্থের চিত্রণ বিষয়ে আলোচনায় একটা কথা বার বার আমাদের মনে হয়, এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কি সবটা অন্যদের ওপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন, নাকি ছাপার প্রসঙ্গে কবির নিজেরও কোনো ভাবনা-চিন্তা ছিলো! বইয়ে ছবির ব্যবহার, মলাট, কাগজ, বাঁধাই ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কি কোনো নির্দেশ দিতেন? এখানে অবাক হতে হয়, ছবি ছাপার ব্যাপারে তাঁর এক্সপার্ট -কমেন্ট্ দেখে। 'খাপছাড়া'র ছবির বিষয়ে কিশোরীকে তিনি পরামর্শ দিচ্ছেন— 'কালো কালীর যে নমুনা পাঠিয়েছ সে তো ভালোই— ওর চেয়ে সীপিয়া ভালো। আমার বোধ হয় লাইন ব্লক এবং লেটার প্রেস্ এক কালী হলেই ভালো— অন্যগুলো সীপিয়া'।

আবার কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদ হিসেবে তাঁর নিরলঙ্কারণ সাধারণ সিম্পল মলাটই বেশি পছন্দ। যেমন 'বীথিকা'র মলাটের ব্যাপরে অত্যন্ত কড়া নির্দেশ ছিলো রবীন্দ্রনাথের— 'মলাটে সাদা অক্ষরে ''বীথিকা'' যেন লেখা থাকে, আমি অলঙ্কৃত করে দেবো না। এই রকম সাজসজ্জা বাঙালে রুচি, নিজের বই সম্বন্ধে নতুন লেখকের গদগদ স্নেহের সোহাগ এতে প্রকাশ পায়। জাপানীরা তলোয়ারে কারুকার্য করে, খাপ রাখে অত্যন্ত সাদা, যেহেতু তারা আর্টিস্ট— যদিচ পূর্ব্ববঙ্গ পেরিয়েও পূর্ব্বতর দেশে তাদের জন্ম।'

এখানে 'বাঙালে রুচি' এবং 'পূর্ব্ববঙ্গ' কথাটার পিছনে সুধীরচন্দ্র করের প্রতি একটা স্নেহের খোঁচা আছে।

আবার কখনো কাগজের বইয়ের দাম চড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় কখনোও কিশোরীমোহনকে জানাচ্ছেন— ‘কাগজ সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করা মিথ্যা। তোমরা বিচার করে যা ভালোবোধ করো তাই হবে তবে এইটুকু জেনে রেখো অত্যন্ত দাম চড়িয়ে দিতে আমার আপত্তি আছে।’ শুধু তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রে বই প্রকাশের উপযুক্ত সময়ের কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন— যা কি না বই বিক্রির অনুকূল। যেমন ‘সে’ প্রকাশিত হবার প্রাক্কালে কিশোরীরকে লিখেছেন— ‘যদি মনে করো ২৫শে বৈশাখের নিকটবর্তী সময় বই কাটতির পক্ষে নীরস ঋতু তাহলে ওটাকে আষাঢ় শ্রাবণের দিকে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে। ‘খাপছাড়া’র প্রতি সাধারণের দৃষ্টিপাত কী রকম অনুভব করচ? ওরও হয়তো অসময়ে জন্মলাভ হয়েছিল।’

অন্য দিকে খোঁজ করলে দেখা যাবে ‘ছড়ার ছবি’র বাজেটের দিকে তাকিয়ে নন্দলালের কিছু ছবি পুনরায় লাইন-ড্রয়িঙে আঁকানোর কাজ সারতে হয়েছে। বিশেষ করে ছবির বইয়ের জন্যই বাজেট সংক্রান্ত এই ভাবনা। এ বিষয়েও কিশোরীকে লেখা সেই চিঠির টুকরো— ‘নন্দলাল ছবিগুলোকে কালিকলমে সস্তা করে দিচ্ছেন। ছবির সঙ্গে ছাপাখানার যোগসাধন ব্যাপারে তোমার পৌরোহিত্যের দরকার, আমি বুঝি নে। ছবির ছড়া বইটা সম্বন্ধে আলোচ্য বিষয় অনেক আছে।’

‘আমি বুঝি নে’ বলছেন বটে, কিন্তু সেটা যে ততটা সত্যি কথা নয়— তা আমরা সকলেই জানি। এমন কি তাঁর ছবির অ্যালবাম ‘চিত্রলিপি’ প্রকাশের আগে তার কাগজ নিয়েও ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ বিষয়ে তাঁর ছাপাখানার কাণ্ডারী কিশোরীর সঙ্গে পরামর্শ করেছেন— ‘ছবির অ্যালবম কি দিশি তুলোটা কাগজে চলে না? একটা পরীক্ষা করেই দেখ না— একটু কর্কশ গোছের হলে তো ভালই পাৎলা লেই বা দোষ কি’ ইত্যাদি। আবার ‘ছেলেবেলা’ সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত স্পষ্ট কড়া নির্দেশ ছিলো : ‘ছেলেবেলা’ ছাপা শেষ হয়ে গেল। এই বইটাতে আমি কোনরকম ছবি দিতে চাই নে। এর ছবি লেখারই মধ্যে। সাহিত্যের মধ্যে অকারণ ছবি এনে চোখ ভোলানো ছেলেমানুষি। ছবি দেবার চেষ্টাও কোরো না।

কবির হুকুম অমান্য করে ‘ছেলেবেলা’তে সে সময় কোনো ছবি যোগ করা হয়নি। পরে অবশ্য কবির এই নির্দেশকে মান্যতা দেওয়া হয় নি। ‘সাহ্যিতর মধ্যে অকারণ ছবি’ দিয়েই ভরিয়ে তোলা হয়েছে সাম্প্রতিক কালের প্রকাশিত ‘ছেলেবেলা’। কারণ গ্রন্থপ্রকাশের অনেকটাই যেন আজ তাঁর ভাষায় ‘চোখ ভোলানো ছেলেমানুষি’। আর ছবি বাদ দিয়ে ‘ছেলেবেলা’ প্রকাশের এই নির্দেশই বোধ করি অসুস্থ কিশোরীমোহনের কাছে পৌঁছোনো রবীন্দ্রনাথের শেষ চিঠি। বই প্রকাশের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের এই সব ছোটোখাটো মতামত ও নির্দেশে ধরা আছে তাঁর ভাবনা আর পরিকল্পনার মূল্যবান সারসংক্ষেপটুকু। রবীন্দ্রসাহিত্য চিত্রণ ও মুদ্রণের আলোচনার প্রেক্ষাপটে, নানা স্তরের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে যে বিচিত্র ট্যাপিস্ট্রি, যেখানে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের শিল্পভাবনাও একটি অবশ্যম্ভাবী জরুরি সুতো। এ কথা আমাদের কখনোই ভুললে চলে না।